গণবিজ্ঞান ভাবনার পত্রিকা

বিজ্ঞান অন্বেষক

বর্ষ-১৪ সংখ্যা-২ মার্চ-এপ্রিল ২০১৭ RNI No.WBBEN/2003/11192 মূল্য : ৫ টাকা

❑ চাষিদের বন্ধু কোকিল ৪ ❑ পরমাণু জগতের গ্যালিলিও ২ ❑ খাদ্যে ভেজাল ৪ ❑ টি সেল ভ্যাকসিন্ ৫ ❑ অলৌকিক নয় লৌকিক ৬ ❑ সংকর্ষণ রায় ৬ ❑ অঙ্ক ৭ ❑ কুসংস্কার ৮ ❑ স্বাস্থ্য ৯ ❑ ধারাবাহিক : ডা: সুভাষ মুখোপাধ্যায় ১১ ❑ সংবাদ ১২ ❑ মহাকাশ ১৪ ❑ জানো কি? / কবিতা / কার্টুন ১৬

আমাদের কথা

বিজ্ঞান, পরিবেশ, স্বাস্থ্য—এই তিনের সঙ্গে প্রাণের যাতায়াত। পৃথিবীই প্রাণের বাসভূমি। চেতনায় ঋদ্ধ মানুষকেই এই প্রাণপৃথিবীকে রক্ষা করতে হবে। প্রাত্যহিক জীবনকে চিনতে ও তার সঠিক ব্যবহারের লক্ষ্যে বিজ্ঞানের যুক্তিকে বুঝতে হবে।

পত্রিকার ছোট ছোট লেখা ও ছবিগুলো মানুষের বিজ্ঞান জিজ্ঞাসাকেই একটু নাড়া দিতে চায়। ১৪ বছরের ধারবাহিক চলাকে আরও সজীব করার উদ্দেশ্যে গত সংখ্যা থেকে নব কলেবরে এর প্রকাশ। আপনারা লেখা ছবি মতামত পাঠান। পত্রিকাটিতে হিমোগ্লোবিন আসুক। শেষ পর্যন্ত এটি আমাদের প্রত্যেকের নিজের পত্রিকা হয়ে উঠুক।

পরমাণু জগতের গ্যালিলিও

ড. অমিতাভ চক্রবর্তী

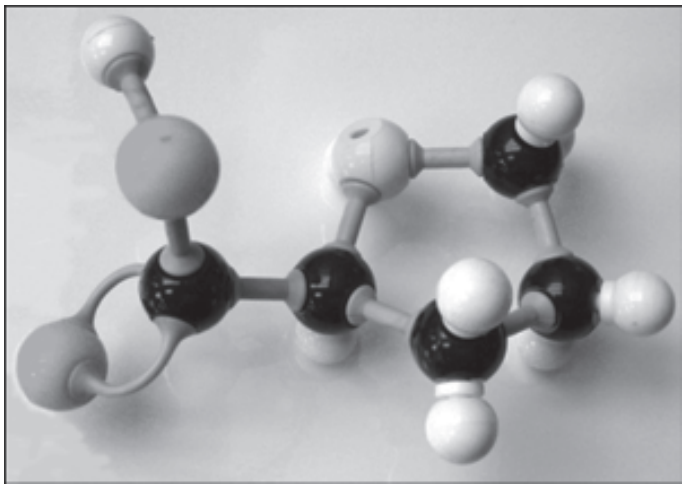

রাসায়নিক বন্ধন

আহমেদ জুয়েল

রাসায়নিক বিক্রিয়া মানেই বিক্রিয়ায় অংশগ্রহণকারী কিছু পরমাণুর মধ্যেকার পুরোনো বন্ধন ভেঙে গিয়ে নতুন বন্ধন তৈরি। এর ফলেই উৎপন্ন হয় নতুন নতুন বিক্রিয়াজাত পদার্থ। কিন্তু অত্যন্ত ক্ষুদ্র পারমাণবিক জগতে এই প্রক্রিয়া সরাসরি অনুধাবন করা দীর্ঘদিন ধরে ছিল বিজ্ঞানীদের হাতের বাইরে। এমনকি ১৯৯০ সালের আগে পর্যন্ত রসায়ন এবং বিজ্ঞানের এই শাখার ছাত্রদের শেখানো হতো যে রাসায়নিক বিক্রিয়ার সময় পারমানবিক পুনর্বিন্যাসের প্রক্রিয়া সরাসরি অনুধাবন করা অসম্ভব। অত্যন্ত দ্রুত ঘটে যাওয়া এই ঘটনার সময়কাল আসলে ফেমটোসেকেন্ড ক্রম (order)-এ। ফেমটোসেকেন্ড হল এক সেকেন্ড সময়ের দশ কোটি ভাগের এক ভাগ, অর্থাৎ $১০^{-১৫}$ সেকেন্ড। সত্যিই আমাদের হাতে এমন কোনো প্রযুক্তি ছিল না যা দিয়ে এই ফেমটোসেকেন্ড ক্রমে ঘটে যাওয়া কোনো ঘটনা পর্যবেক্ষণ করা যায়।

বিজ্ঞানের এই সীমাবদ্ধতাই অতিক্রম করেছিলেন আহমেদ জুয়েল (Ahmed Zewali)। আমেরিকার ক্যালিফোর্নিয়া ইনস্টিটিউট অফ্ টেকনোলজি (ক্যালটেক)-তে তিনি বানিয়েছিলেন আলট্রাফার্স্ট লেজার, যা ফেমটোসেকেন্ড সময়ের ব্যবধানে পাল্‌স তৈরি করতে সক্ষম। সম্ভব হল রাসায়নিক বিক্রিয়াকালে পরমাণুদের বন্ধন ভাঙ্গা-গড়ার ছবি তোলা। এই অসাধারণ সাফল্যের জন্য ১৯৯৯ সালে নোবেল পুরস্কার পেয়েছিলেন জুয়েল। পুরস্কার গ্রহণ অনুষ্ঠানে নোবেল কমিটির সদস্য বেঙ্গট নর্ডেন জুয়েলের আলট্রাফার্স্ট লেজার প্রযুক্তিকে গ্যালিলিওর টেলিস্কোপ আবিষ্কারের সাথে তুলনা করেন। নর্ডেন বলেন গ্যালিলিও যেমন তার টেলিস্কোপের সাহায্যে আকাশের দিকে তাকিয়ে গ্রহ-নক্ষত্র-উপগ্রহ দেখে আমাদের জানার জগতে স্বর্গের মিথ ভেঙে দিয়েছিলেন ঠিক একই কাজ জুয়েল করেছেন পরমাণুদের রাজ্যে। তাই সর্ব অর্থেই এই আবিষ্কার যেন রসায়ন বিজ্ঞানের বিপ্লব।

১৯৬১তে আলট্রাফার্স্ট লেজার পাল্‌স ও ফটোইলেকট্রিক এফেক্ট ব্যবহার করে জুয়েল এক নতুন ধরনের ইলেকট্রন মাইক্রোস্কোপ ডিজাইন করেন যেখানে একটি নির্দিষ্ট ইলেক্ট্রনের স্রোত ফেমটোসেকেন্ড স্কেলে পুনরাবৃত্ত হয়ে কঠিন পদার্থ ও তাদের পৃষ্ঠতলে পরমাণুর গতিবিদ্যা সংক্রান্ত অনুসন্ধান চালাতে পারে। যে কোনো সাধারণ

ইলেকট্রন মাইক্রোস্কোপের তুলনায় জুয়েলের এই যন্ত্র দশ লক্ষ হাজার গুন দ্রুত কাজ করতে সক্ষম। তার তৈরি 4D ইলেকট্রন মাইক্রোস্কোপ তো আজকাল জীববিদ্যা, শারীরবিদ্যা সহ ভৌত রসায়নের নানারকম গবেষণার অগ্রগতিতে গুরুত্বপূর্ণ আবদান রাখছে। *The 4D Visualization of Matter* নামে ২০১৪ সালে লেখা জুয়েলের বইটিকে অপর নোবেলজয়ী বিজ্ঞানী রজার কর্ণবার্গ 'a chronicle of an extraordinary journey of invention and discovery' বলে আখ্যা দিয়েছেন।

মিশরের রাজধানী শহর কায়রো থেকে উত্তর-পশ্চিমে ১৬০ কিলোমিটার দূরে নীল নদের মোহনার কাছাকাছি ছোট্ট দ্বীপ-শহর দামনহার। ১৯৪৬ সালে এই শহরেই এক সাধারণ পরিবারে জন্মেছিলেন আহমেদ জুয়েল। বাবা হাসান ছিলেন সরকারী কর্মী। ছেলেবেলা থেকেই পড়াশোনায় অত্যন্ত আগ্রহী ও মেধাবী আহমেদকে নিয়ে মা রোহিয়ার চিন্তার অন্ত ছিল না। পড়া ছাড়া ছেলের শখ যে কেবল নীল নদের ধারের জনবিরল গ্রাম ও উপত্যকায় একা একা ঘুরে বেড়ানো! তাছাড়া ওর আরেক নেশা হল গান শোনা। বিখ্যাত সংগীতজ্ঞা উম খুলতানের ভক্ত সে। আর এই বয়সেই কাকার সাথে উম খুলতানের কয়েকটি অনুষ্ঠানও দেখে ফেলেছে। স্কুলের পড়া শেষ করে আহমেদ ভর্তি হন মিশরের শতাব্দী প্রাচীন আলেকজান্দ্রিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে। বিষয় রসায়ন। সেখান থেকে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর শেষে ওই বিশ্ববিদ্যালয়েই দুই বছর ইন্সট্রাক্টার হিসাবে কাজ করেন। কিন্তু রসায়ন ও গবেষণার স্বপ্নে বিভোর আহমেদ সেখানেই নিজেকে আটকে রাখলেন না। পিএইচডি করার ইচ্ছে নিয়ে আহমেদ যোগাযোগ করতে লাগলেন আমেরিকা ও ইউরোপের প্রথম শ্রেণির বিশ্ববিদ্যালয় গুলিতে। যদিও বেশীরভাগ জায়গা থেকেই কোনো উত্তর এলো না। কিন্তু এতে দমে যাবার পাত্র তিনি নন। নিজের যোগ্যতা জানিয়ে তিনি একের পর এক বিশ্ববিদ্যালয় ও অধ্যাপকের কাছে চিঠি লিখে যেতে লাগলেন। অবশেষে এলো বহু আকাঙ্ক্ষিত জবাব। পেনসিলভেনিয়া বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইতিবাচক সাড়া পেলেন তিনি। ১৯৬৯ এর ২৩শে আগস্ট ভালোভাবে ইংরাজী বলতে না পারা আহমেদ কায়রো বিমান বন্দর থেকে আমেরিকার উদ্দেশ্যে রওনা দেন। শুরু হয় পিছিয়ে পড়া দেশ ও সমাজের এক ছাত্রের বিজ্ঞানতীর্থে নিজেকে যোগ্যতম হিসাবে প্রমাণ করার লড়াই। যে লড়াইয়ের ময়দান থেকে কোনোদিন নিজেকে আড়াল করার কথা ভাবেননি তিনি। অধ্যাপক রবিন হচস্ট্রাসেরের অধীনে পিএইচডি গবেষণা শেষ করে আই বি এম ফেলো হিসাবে দু'বছর কাজ করেন ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের বার্কলে ক্যাম্পাসে। বিষয়বস্তু সম্পর্কে তুখোড় বিশ্লেষণী ক্ষমতা এবং গবেষণায় অভাবনীয় সাফল্যের স্বীকৃতি হিসাবে ১৯৭৬ সালে ক্যালিফোর্নিয়া ইনস্টিটিউট অফ্ টেকনোলজিতে কেমিক্যাল ফিজিক্সের সহকারী অধ্যাপক হিসাবে যোগ দিলেন আহমেদ জুয়েল। তারপর ১৯৮২ থেকে কয়েক বছর পূর্ণ অধ্যাপক হিসাবে থাকার পর নব্বইয়ের দশক থেকে তিনি *লাইনাস পাউলিং চেয়ার অধ্যাপক* হিসাবে আজীবন ক্যালটেকে কাটিয়েছেন। একাধারে উদ্যোমী ও অসাধারণ সব উদ্ভাবনী ক্ষমতার অধিকারী অধ্যাপক জুয়েল নোবেল পুরস্কার ছাড়াও পেয়েছেন অনেক আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি, সামলেছেন একাধিক গুরুত্বপূর্ণ পদের দায়িত্ব। ২০০৯ সালে বারাক ওবামা প্রশাসনের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিভাগের উপদেষ্টা কমিটির সদস্য হন তিনি। তাছাড়া ওই একই বছর তিনি নিযুক্ত হন মধ্যপ্রাচ্যের প্রথম আমেরিকান বিজ্ঞান-দূত হিসাবে।

বিশ্বের প্রথম শ্রেণির দেশের প্রথম শ্রেণির নাগরিক হিসাবে নিজেকে তুলে ধরার পরও জুয়েল কিন্তু তার দেশ ও সমাজকে ভুলে যান নি। মধ্যপ্রাচ্যের শিক্ষাব্যবস্থা এবং বিভিন্ন প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়নে বিভিন্ন সময়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিলেন তিনি। ২০০০ সাল কায়রোর উপকণ্ঠে স্থাপিত হয় জুয়েল সিটি অফ সায়েন্স এন্ড টেকনোলজি। যার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন হয় ২০১১-তে। স্বপ্নের এই শহর গড়ে তুলতে অতিমানবিক তৎপরতায় একের পর এক পদক্ষেপ নিয়েছিলেন অধ্যাপক আহমেদ জুয়েল। মিশরের সর্বোচ্চ অর্ডার অফ দি গ্র্যান্ড কলার অফ নাইল-এ ভূষিত অধ্যাপক জুয়েল প্রায় ৬০০টি গবেষণাপত্র এবং ১৪টি বই এর রচয়িতা। অসাধারণ বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ ক্ষমতা ও প্রযুক্তিগত বুদ্ধিমত্তার পাশাপাশি জুয়েলের ইতিহাস বিষয়ক জ্ঞানও কিছু প্রশংসার দাবি রাখে। তার আত্মজীবনীমূলক বই Voyage Through Time-তো আসলে মধ্যপ্রাচ্যের পিছিয়ে পড়া দেশ ও সমসাময়িক সমাজের এক প্রয়োজনীয় দলিল। বিজ্ঞানের ইতিহাস বলতে গিয়ে তিনি অতীত পৃথিবীর গণিত ও বিজ্ঞানচর্চায় আরবীয়দের উল্লেখযোগ্য অবদানের কথা নানা জায়গায় বলেছেন। আগ্রাসী পাঠক, চিন্তাবিদ, বিজ্ঞানী ও প্রযুক্তিবিদ্যায় অসাধারণ উদ্ভাবনী ক্ষমতার অধিকারী অধ্যাপক জুয়েল বিজ্ঞান তথা শিক্ষায় মধ্যপ্রাচ্য তথা পিছিয়ে পড়া দেশগুলির সাফল্য নিয়ে সবসময় আশাবাদী ছিলেন। তিনি মনে করতেন উচ্চমেধা ও যথেষ্ট সম্ভাবনাময় ছাত্র-ছাত্রীরা রয়েছে এই দেশগুলিতে। দরকার কেবলমাত্র যথোপযুক্ত পরিকাঠামো এবং সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন।

বেশ কিছুদিন ধরেই শারীরিক অসুস্থতার জন্য প্রথাগত কাজকর্মে নানা ভাবে বাধাপ্রাপ্ত হচ্ছিলেন। জানা যায় স্পাইনাল কর্ডের টিউমারে বাসা বেঁধেছে ক্যান্সার। চলতে থাকে দেহে এবং মনে এই মারণব্যাধির সাথে অসম লড়াই। ৩১ জুলাই, ২০১৬ রবিবার বিকালে MBC Egypt টিভিতে ঘোষিত হল তাদের প্রিয় বিজ্ঞানী গুরুতর অসুস্থ। এবার জীবনের কাছে সত্যি হার মানতে হল প্রতিকূল পরিস্থিতিতে কখনো পিছিয়ে না আসা মেধাবী ও বিজ্ঞানপ্রিয় এই মানুষটিকে। ২ অগাস্ট ৭০ বছর বয়সে মারা গেলেন আরবদুনিয়ার সর্বকালের সেরা বিজ্ঞানী আহমেদ হাসান জুয়েল।

E.mail.acnbu13@gmail.com, M : 9434377067

খাদ্যে ভেজাল ধরবেন কিভাবে : রঙিন শাকসবজি

জয়দেব দে

ইদানিং প্রায়ই শোনা যায় শাকসবজিতে ভয়ঙ্কর রঙ মেশানো হচ্ছে। বাজারে গিয়ে প্রায়ই আমাদের নানা ধরনের শাকসবজি কিনে আনতে হয়। যেমন পটল, ঢেঁড়শ, উচ্ছে, ঝিঙে, বিন, বরবটি, ব্রকোলি, মটরশুটি, বেগুন, পেঁপে, লঙ্কা সহ নানাধরনের সবুজ শাকসবজি। লক্ষ করলে দেখবেন ইদানিং এগুলো অতিরিক্ত সবুজ লাগে। কিভাবে এটা করা হয়?

ম্যালাকাইট গ্রিন বা তুঁতের দ্রবনে ভিজিয়ে রাখা হয়। বেশ কয়েক ঘণ্টা রেখে তারপর বস্তার উপর রেখে সামান্য শুকিয়ে বাজারে আনা হয়। এরপর বেশ চকচকে লাগে।

এই সব রঙিন শাকসবজি খাওয়া স্বাস্থ্যের পক্ষে বেশ ক্ষতিকারক। যেসব সবজি খোসা ছাড়িয়ে রান্না করা হয়, সেখানে বিষাক্ত রঙের প্রভাব কিছুটা কমতে পারে। কিন্তু যেখানে খোসা ছাড়ানোর ব্যাপারটা নেই (যেমন ঢেঁড়শ, উচ্ছে, বিন, বরবটি, ব্রকোলি ইত্যাদি) সেখানে সবজির গায়ে সেঁটে থাকা রঙ সহজেই খাবারের মধ্যে দিয়ে শরীরে প্রবেশ করে। পাকস্থলিতে ক্ষরিত হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডের সঙ্গে বিক্রিয়ায় বিষাক্ত ম্যালাকাইট গ্রিন ক্লোরাইড লবণ তৈরি করে।

$$C_6H_5CH\left(C_6H_4N(CH_3)_2\right)_2 + HCl + \tfrac{1}{2}O_2 \rightarrow$$

(ম্যালাকাইট গ্রিন)

$$\left[C_6H_5C\left(C_6H_4N(CH_3)_2\right)_2\right]Cl + H_2O$$

(ম্যালাকাইট ক্লোরাইড লবণ)

প্রশ্ন হল এ ধরনের সবজি চিনবেন কিভাবে? সবজির বোঁটার দিকটা লক্ষ করুন। সাধারণভাবে বোঁটা হওয়া উচিত ধূসর বর্ণের। কিন্তু রঙে চোবানো সবজির বোঁটাটাও হবে রঙিন। বাজার থেকে এধরনের সবজি কেনা উচিত নয়।

❑ বাড়িতে কিভাবে এই পরীক্ষা করবেন?

সাদা তুলো তরল প্যারাফিনে বা নারকেল তেলে ভিজিয়ে রঙিন শাক সবজির গায়ে ঘষতে থাকলে তুলো সবুজ হলে বুঝতে হবে ম্যালকাইট গ্রিন বা তুঁতে মেশানো আছে।

❑ কী কী ক্ষতি হয়?

এই নিষিদ্ধ রঙ এর জন্য শুক্রাশয়, মূত্রাশয়, প্লীহা, কিডনি, যকৃত ও স্তনের রোগ হয়। বিশেষ করে টিউমার হবার সম্ভাবনা থাকে। গ্যাসট্রাইটিস হতে পারে।

চাষিদের বন্ধু কোকিল

সম্রাট সরকার

শীতের শুরুতেই আমাদের গ্রামের পটলের খেতগুলোর প্রয়োজন ফুরোয় তাদের মালিকের কাছে। তাদের মালিক, মানে চাষিরা খেতগুলোকে নতুন করে গড়ে তোলার জন্য খেতগুলোকে নষ্ট করে ফেলেন। কারণ সারা বছর ধরে ফলন দেওয়ার পর পটল গাছের জন্য তৈরি মাচা নড়বড়ে হয়ে যায়। গাছগুলোর উৎপাদন শক্তিও কমে আসে। শীতের শুরুতে পটলের বাজারও পড়তে থাকে। চাষিরা মরসুমের শেষের দিকে খেতের ফসল নিয়ে উৎসাহ হারিয়ে ফেলেন।

ফলস্বরূপ বেশ কিছু পটল খেতে মাচার ওপর পড়ে থেকে থেকে পেকে কমলা হয়ে যায়। সেই সব পাকা পটলের লোভে তখনই শুরু হয় বেশ কিছু পাখির আনাগোনা। তাই শীতের শুরুতে আমাদের গ্রামের পটলের খেতগুলো ছোটোখাটো Bird Watching Spot।

শুধু পাকা পটলের জন্য নয়, দীর্ঘদিনের অপরিষ্কারের ফলে পটল মাচার নিচে বেড়ে ওঠা ঘাসের বীজ খেতে হরেকরকম মুনিয়ারা আসে। আবার ঘন ঘাসের নিচে পোকামাকড় খেতে আসে খঞ্জনা (Wagtail), তুলিকা (Olive-backed Pipit), মাঠ-চড়াই (Paddyfield Pipit), ছাতারে (Jungle Babbler) ইত্যাদি। আর পাকা পটলের লোভে যারা আসে তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল বুলবুলি (Bulbuls), বিভিন্ন শালিক (Mynas, Starlings) এবং অবশ্যই কোকিল (Asian Koel)।

আমি লক্ষ করে দেখেছি যারা পাকা পটল খেতে আসে তাদের মধ্যে কোকিলের পাকা পটল খাওয়ার স্বভাব সবচেয়ে আকর্ষণীয়। আকর্ষণীয় এই অর্থে যে বুলবুলি, শালিকেরা যেখানে পাকা পটল ঠুকরে ঠুকরে রসালো শাঁস খায় সেখানে কোকিল চেষ্টা করে সম্পূর্ণ অন্যরকম ভাবে।

মাচার ওপর বসে প্রথমে ভালো ভাবে খোঁজে কোথায় পাকা পটল আছে। এবং অবশ্যই সেটা তার নাগালের মধ্যে আছে কিনা। মাচার ওপর থেকে নিচে ঝুলতে থাকা পাকা পটল ঝুঁকে পড়ে ডাল থেকে ছিঁড়ে নেওয়া তার মতো অপেক্ষাকৃত বড়সড় চেহারার পাখির পক্ষে একটু কষ্টসাধ্য। তাই পাকা পটলটি তার সুবিধামতো জায়গায় আছে কিনা সেটা খুব গুরুত্বপূর্ণ। তারপর পছন্দের পটলটিকে চিহ্নিত করতে পারলে ঠোঁট দিয়ে ছিঁড়ে নেয়। ঠোঁটে তুলে নেওয়ার পর কিন্তু কখনোই বুলবুলি, শালিকদের মতো খেতে শুরু করে দেয় না। অথবা ডালের সঙ্গে ঝুলে থাকা অবস্থাতেই ঠোকরাতে শুরু করে না। খেয়াল করে দেখেছি পটল আস্ত খেতে তাদের উৎসাহ বেশি।

তাই পটলটিকে আস্ত গলাধঃকরণ করতে সেটিকে শুন্যে ছুঁড়ে দেয়। এবং পাকা পটলটিকে আস্তই গিলে নেয়।

ক্ষণিকের পর্যবেক্ষণটি এখানেই শেষ হলেও কোকিলের এই আস্ত ফল গিলে খাওয়া তাদের একটি অনন্য বৈশিষ্ট্যের মধ্যে পড়ে। ছবিতে যে পাকা পটলটিকে খেতে দেখছেন সেটি লম্বায় প্রায় ৩০ মিমি। পর্যবেক্ষণটি থেকে নিচে উল্লেখিত সিদ্ধান্তে আসা যায়।

১। অন্যান্য অনেক পাখিদের তুলনায় কোকিলদের গলার ভেতরের ফাঁক (Throat Gap) বেশি। তাই সহজেই আস্ত পাকা ফল মুখে পুরতে ও গিলে ফেলতে তাদের কোনো অসুবিধা হয় না। শুধু পাকা ফল নয়, বড়সড় শুঁয়োপোকা (Hairy Caterpillar) ওরা আস্ত গিলে খেতে পারে।

২। পটলের জন্য অন্যতম ক্ষতিকারক কীট হল ফ্রুট ফ্লাই। ওরা আধ-খাওয়া পাকা পটলের মধ্যে ডিম পাড়ে। তাদের লার্ভা ও পিউপা পাকা পটলের শাঁস খেয়ে পূর্ণাঙ্গ ফ্রুট ফ্লাই-এ পরিণত হয়। এই ফ্রুট ফ্লাই ফলের মধ্যের শাঁসালো অংশ খেয়ে নেয়। অন্যান্য পাখিরা যেহেতু পাকা পটল ঠুকরে খায় সেহেতু তাদের আধ-খাওয়া পটলের মধ্যে এই ফ্রুট ফ্লাইদের ডিম পাড়ার সম্ভাবনা থেকেই যায়। কিন্তু কোকিল যেহেতু আস্ত পটলটাকেই গিলে নেয় সেইহেতু ফ্রুট ফ্লাইদের ডিম পাড়ার জায়গা কিছুটা হলেও কমে যায়। তাই কোকিল আস্ত পটল গিলে খেলে চাষিভাইদের অনেক সুবিধা। এভাবেই আমাদের দেশের অতি-পরিচিত একটা পাখির অতি-অপরিচিত খাওয়ার অভ্যাস সকলের অজান্তে চাষ-আবাদের উপকার করে চলেছে।

E.mail:samratswagata11@gmail.com, M : 9433962227

টি সেল ভ্যাকসিন্

সিদ্ধার্থ জোয়ারদার

আমাদের রাজ্যের ৮০ শতাংশ ডিম আসে চরে খাওয়া বা মুক্তাঙ্গন পদ্ধতিতে পালিত মুরগি থেকে। আর এই ধরনের পালিত মুরগির একটি ভয়ানক রোগ হল 'ফাউল পক্স' বা গুটি বসন্ত। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই এই রোগের প্রচলিত টিকা কার্যকর হয় না। তাই মুরগির গুটি বসন্তের টিকার মান আরও উন্নত কিভাবে করা যায়, তার প্রয়াস চলছিল বহুদিন যাবৎ। সম্প্রতি মুরগির গুটি বসন্ত প্রতিরোধে উন্নতমানের টিকা তৈরির দিশা দেখালেন বাংলার একদল গবেষক। বেলগাছিয়ায় অবস্থিত রাজ্যের প্রাণী ও মৎস্য বিজ্ঞান বিশ্ববিদ্যালয়ের ভেটেরিনারি মাইক্রোবায়োলজী বিভাগের ছয় গবেষক এই কর্মকান্ডে যুক্ত ছিলেন। তাঁদের করা গবেষণার ফলাফল ইতিমধ্যে প্রকাশিত হয়েছে 'অ্যাভিয়ান ডিজিজ' নামে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে প্রকাশিত একটি বিখ্যাত জার্নালে। এঁরা টি-লিম্ফোসাইট ভিত্তিক টিকা তৈরির অ্যান্টিজেন শনাক্ত করতে পেরেছেন, যা রীতিমত একটি কঠিন কাজ।

বিভিন্ন সংক্রামক রোগের হাত থেকে নিজেদের বাঁচাতে আমরা টিকা ব্যবহার করি। টিকার মাধ্যমে বিভিন্ন রোগ সৃষ্টিকারী জীবাণুদের প্রতিরূপ বা 'ড্যামি' ব্যবহার করা হয়। এরা পরিভাষায় অ্যান্টিজেনিক বস্তু। এরা আমাদের দেহজ প্রতিরক্ষাতন্ত্র বা 'ইমিউন সিস্টেম'-কে চাঙ্গা করে তোলে, যাতে আমাদের শরীর পরবর্তীকালে আসল জীবাণুদের বিরুদ্ধে লড়াই করে জয়লাভ করতে পারে। আমাদের শরীরে ঢুকে পড়া জীবাণুর আক্রমণ থেকে বাঁচাতে দুধরনের লিম্ফোসাইট কোষ বিশেষ ভূমিকা নেয়—'বি' ও 'টি' লিম্ফোসাইট। আমরা যে সমস্ত টিকা ব্যবহার করি, তারা 'বি' লিম্ফোসাইটকে উদ্দীপ্ত করে আমাদের শরীরে অ্যান্টিবডি তৈরি করে, যা জীবাণু ধ্বংস করতে সক্ষম। কিন্তু ব্যাকটেরিয়া বা ভাইরাস যখন কোষের মধ্যে ঢুকে পড়ে তখন আর অ্যান্টিবডি কাজে আসে না। তখন প্রয়োজন হয় আক্রান্ত কোষ ধ্বংসকারী কিছু 'টি' লিম্ফোসাইটের, যারা 'পারফোরিন' ও 'গ্র্যাঞ্জাইম'-নামক দুটো প্রোটিন যৌগের সাহায্যে শরীরের আক্রান্ত কোষকে মেরে ফেলে। 'টি-লিম্ফোসাইট উদ্দীপক টিকা' অ্যান্টিজেনের মাধ্যমে এই ধরনের টি-লিম্ফোসাইটকে উজ্জীবিত করতে সাহায্য করে। তার জন্য দরকার উপযুক্ত কিছু অ্যান্টিজেনকে খুঁজে পাওয়া। গবেষক দলটি উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহার করে সেই দুরূহ কাজটিই করেছেন। খুঁজে পেয়েছেন টি-লিম্ফোসাইট-এর 'টার্গেট' অ্যান্টিজেন, যা ফাউল পক্স প্রতিরোধে অভিনব টি-লিম্ফোসাইট ভিত্তিক টিকা তৈরিতে ভীষণভাবে কাজে লাগবে। টি-কোষ ভিত্তিক টিকা উৎপাদনের অভিনব এই প্রয়াস মানুষের বিভিন্ন ভাইরাস ঘটিত টিকা তৈরির প্রচেষ্টাকে যে উৎসাহিত করবে, তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না।

লেখকের পরিচিতি : পশ্চিমবঙ্গ প্রাণী ও মৎস্যবিজ্ঞান বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক, E.mail : joardar69@gmail.com, M : 9231533335

অলৌকিক রান্নাঘর

বিবর্তন ভট্টাচার্য

রান্নাঘরে রান্না করছিল দিপালী। হঠাৎই কাঁপা শুরু হয়ে গেল রান্নাঘর। তারিখটা ২০১৬ সালের ১লা মে, সেদিন বাড়িতেই ছিলেন তার কৃষিশ্রমিক স্বামী। স্ত্রী উঠোনে দাঁড়িয়ে চিৎকার করছেন ভূমিকম্প বলে। পাড়ার প্রায় সমস্ত মানুষ দৌড়ে এসেছেন। দিপালীর কি মাথা খারাপ হয়ে গেল? কারও বাড়ি কাঁপছে না, এমনকি ওদের শোয়ার ঘরও কাঁপছে না। তবে এমনকি হল যে, রান্নাঘর কাঁপছে। প্রথমে কেউ দেয়ালটা স্পর্শ করবার সাহস পাচ্ছিল না এগিয়ে এসে। টিনের একটা ঝিনঝিন আওয়াজ সবসময়ে হয়ে চলেছে তা বুঝতে পারছিল। কিন্তু কিভাবে হচ্ছে তা ঠিক বুঝতে পারছিল না। তবে রান্নাঘর কেঁপে চলেছে এটা বোঝা যাচ্ছিল।

কালিনারায়ণপুর স্টেশন পাড়া, বামেগাছি মৌজা, থানা-তাহেরপুর, জেলা-নদিয়ায় এই ঘটনা ঘটছে, নিমেষে ছড়িয়ে পড়ল সাধারণ মানুষের মুখে মুখে। দলে দলে মানুষ জড়ো হতে লাগল গৌতম মণ্ডলের বাড়িতে। ৭$\frac{১}{২}$ / ৮$\frac{১}{২}$ ফুটের টিনের চালের ঘর ৫ ইঞ্চি দেওয়াল। ১লা মে থেকে মাঝে মাঝে কেঁপে চলেছে ঘর। শেষ কেঁপেছিল ৫ই মে, বললেন, পাশের বাড়ির মাস্টারমশাই মৃত্যুঞ্জয় দেবনাথ।

ব্যাপারটা কী? আসলে এই ঘটনার পিছনে গ্রামীন গল্পও রয়েছে। ১লা মে, ঘর কাঁপার ছবি বিভিন্ন ইলেকট্রনিক্স মিডিয়া দেখিয়েছে। তারপর আবার আফটার এফেক্ট হয় ৫ই মে, সকালে ১০.৩০ মিনিটে। ততদিনে কারণ আবিষ্কৃত না হওয়ায় ব্যাপারটা অলৌকিক তা সবাই ধরে নিয়েছেন। তাই আমরা যেদিন গেলাম তার আগের দিন রান্নাঘর ঠাকুরঘরে রূপান্তরিত হয়ে গিয়েছে। বহুলোক যে প্রসাদ পেয়েছেন তা ডোবাতে থার্মোকলের থালা দেখে বোঝা গেল। এরপর পাকাপাকিভাবে তৈরি হবে দেবতার থান তাই টিন দিয়ে আলাদা রান্নাঘর তৈরি হয়ে গেছে। জাগ্রত ঠাকুর মানে আয় বেশি। প্রণামীর বাক্সও তৈরি।

আমাদের পর্যবেক্ষণ :

চূর্ণী নদী থেকে গৌতম মণ্ডলের বাড়ির রান্নাঘর ১৫০ মিটার। এছাড়া কালিনারায়ণপুর স্টেশন পাড়াটা হল চূর্ণীর একটা দ্বীপের মতো। যার ভূ-স্তর দ্বীপের মতো। এখন ওই অঞ্চলে ৫০ ফুট-এ দারুণ জল পাওয়া যায় টিউবওয়েল থেকে। এছাড়া রান্নাঘরের ভিত তলায় ঢালাই ছাড়া ৪ ইটের গাঁথনি ও ভূ-স্তরে বালির ভাগ অত্যন্ত বেশি। এছাড়া চূর্ণীর জলের যে প্রবাহ তা ওই অঞ্চলে ভূ-স্তরের ৫০ ফুটের মধ্যে বর্তমান। তাই গরমের সময় বালিতে জলের পরিমাণ কম থাকায় ও তলায় চূর্ণীর জলপ্রবাহ বর্তমান হওয়াই কম্পনের মূল কারণ। বর্ষার পর এই ধরণের কম্পন আর হবে না বলে আমাদের অনুমান। কারণ মাটি প্রবল বর্ষণে সিঞ্চিত হবে এবং রান্নাঘরের কম্পনও প্রশমিত হবে।

পৃথিবীতে যে ঘটনাই ঘটুক না কেন তা সবসময় কারণ ও কার্য সম্পর্কিত। তাই কোনো কিছুই অলৌকিকভাবে হতে পারে না। ২৭শে জুন আমি ব্যক্তিগতভাবে আবার পর্যবেক্ষণ করি। কম্পন একদম বন্ধ।

E.mail : bibartancbss@gmail.com, M : 9332283356

চলে গেলেন সংকর্ষণ রায়

রাজদীপ ভট্টাচার্য

সময় ১৯৫০ সাল। ঘাটশিলার কাছে সুবর্ণরেখা নদী পার হয়ে দক্ষিণে সিদ্ধেশ্বর পাহাড়ের গা বেয়ে শালের জঙ্গল পেরিয়ে উপর দিকে উঠছেন এক তরুণ। কাঁধে পাথরের নমুনা রাখার ঝোলা, পকেটে লেন্স, কোমরে বেল্টের সাথে বাঁধা কম্পাস এবং হাতে হাতুড়ি। চড়াই পথে সামনে পড়ল একটা সুড়ঙ্গ। এ হল প্রাচীন তাম্রযুগে মানুষের তামা সংগ্রহের উদ্দেশ্যে খননের প্রমাণ। যুবক দাঁড়িয়ে একটু ইতস্তত করছেন। হঠাৎ পিছন থেকে এসে কাঁধে হাত রাখলেন কে একজন। বললেন, কী করছ এখানে?

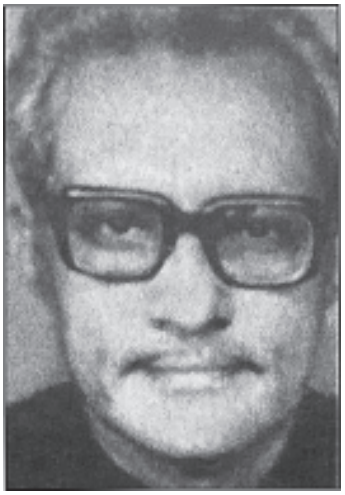

যুবক চমকে ঘুরে দাঁড়িয়ে দেখলেন কথাসাহিত্যিক বিভূতিভূষণ। প্রকৃতিপ্রেমিক এই মানুষটির কাছে দুর্গম অরণ্য, পাহাড়— কোনো কিছুই কোনো বাধা নয়। কথোপকথন শুরু হল। বিভূতিবাবু কথা প্রসঙ্গে জানতে চাইলেন, কি কি আছে এখানকার পাথরে? যুবক বললেন, তামা, কায়ানাইট, অ্যাপাটাইট, নিকেল— এইসব আর কি। বিভূতিভূষণ বললেন, আরো কিছু আছে, অনেক বিস্ময়কর অভূতপূর্ব কিছু, যা তোমরা এখনো টের পাওনি। আমি আমার ষষ্ঠেন্দ্রিয়ে তার ইঙ্গিত পাই। রোমাঞ্চিত হলেন যুবক। কথাবার্তায় ঠিক হল কয়েকদিন বাদে একসাথে সিংভূমের এই বন-পাহাড়ে পরিক্রমায় বেরোবেন দুজনে।

বিভূতিভূষণ কথা রাখেননি। মাত্রা দিন কয়েক বাদেই ১ নভেম্বর, ১৯৫০ আমাদের ছেড়ে চলে গেলেন তিনি। তবে যে আগুন সেই যুবকের হৃদয়ে জ্বেলে দিয়ে গেলেন তার জেরে পরবর্তী পঁয়ত্রিশ বছর ভারতের প্রান্তে প্রান্তে পরশ পাথর খুঁজে ফিরলেন সেই নবীন ভূতাত্ত্বিক, সংকর্ষণ রায়। বিভূতিবাবুর কথা সত্যি করেই সিংভূমে একদিন আবিষ্কার হল অমূল্য পারমাণবিক খনিজ ইউরেনিয়াম।

সংকর্ষণ রায়-এর জন্ম ১৯২৮ সালের ২৫ জুলাই।

স্কটিশ চার্চ স্কুল ও প্রেসিডেন্সি কলেজে পড়াশোনা শেষে ভূতত্ত্বে স্নাতকোত্তর। ১৯৫২ সাল থেকেই বিভিন্ন সরকারি পদে দেশ জুড়ে ভূবৈজ্ঞানিক সমীক্ষার কাজ করেন। ছোটনাগপুর, সিকিম, মধ্যপ্রদেশ, রাজস্থান প্রভৃতি বহু বিচিত্র স্থানে ছড়িয়ে ছিল তাঁর কর্মজীবন। অবশেষে ১৯৮৬ সালে ভারতীয় ভূতাত্ত্বিক সর্বেক্ষণের অধিকর্তারূপে চাকরি থেকে অবসর নেন। সজনীকান্ত দাস এবং নৃপেনকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়ের অনুপ্রেরণা সাহিত্যিক সংকর্ষণের আত্মপ্রকাশে বিশেষ সহায়ক হয়েছিল। মাতৃভাষা বাংলায় বিজ্ঞানের রহস্যকে প্রকাশ করা এবং মানুষের বিজ্ঞান ভাবনার বিকাশ ছিল তাঁর লক্ষ্য। বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় লিখেছেন অসংখ্য প্রবন্ধ, ছোটগল্প। প্রকাশ পেয়েছে অনেকগুলি বই, যেমন—ভূতাত্ত্বিকের চোখে পশ্চিমবাংলা, ভূতাত্ত্বিকের চোখে বিশ্বপ্রকৃতি, বজ্রমানিক রহস্য, মাটি চাপা ইতিহাস, গভীর গহন, ছোটনাগপুরের জঙ্গলে, পারমাণবিক শক্তির উৎস, ফরেনসিক ইত্যাদি। লেখক হিসেবে পেয়েছেন কিশোর জ্ঞান বিজ্ঞান, শিশুসাহিত্য পরিষদ, রণজিৎ বল স্মৃতি পুরস্কার, রবীন্দ্র পুরস্কার প্রভৃতি। তাঁর লেখায় ছত্রে ছত্রে মাটির কাছাকাছি থাকা তথাকথিত অশিক্ষিত দরিদ্র মানুষদের প্রতি মমত্ববোধ প্রকাশ পেয়েছে। অষ্টআশি বছরের এই বরিষ্ঠ ভূতাত্ত্বিক সাহিত্যিক সংকর্ষণ রায়-কে আমরা হারালাম গত ২৩ ফেব্রুয়ারি, ২০১৭-তে।

এক টাকা গেল কোথায়?

কমলবিকাশ বন্দ্যোপাধ্যায়

মহাদেববাবুর স্টেশনারি দোকান। দোকানটা আমাদের পাড়াতেই। পাশেই কালুর চায়ের দোকান। সামনের বেঞ্চিটায় বসে চা-এর গেলাসে সবে চুমুক দিয়েছি এমন সময় মহাদেববাবুর দোকানে তিনটে ছেলে এল। ওরা আমার মুখ চেনা, তবে পরিচয় নেই। আমাদের পাড়ায় একটা মেসবাড়ি আছে, সেখানে থাকে। ওরা দোকানে এসেছে একটা স্টোভ কিনতে। স্টোভের দাম ৮৫ টাকা। প্রত্যেকে ৩০ টাকা করে দোকানের কর্মচারীর হাতে ৯০ টাকা দিল। মহাদেববাবুর কাছ থেকে ৫ টাকা ফেরত নিয়ে কর্মচারীটি ওদের টাকা দিতে গিয়ে দেখল ওরা চলে গেছে। মহাদেববাবু আমার কাছে জানতে চাইলেন আমি ওদের চিনি কিনা। আমি বললাম, 'ওদের সঙ্গে আলাপ নেই, তবে কয়েকদিন আগে মেসবাড়ি থেকে ওদের বের হতে দেখেছি'। আমার কথা শুনে মহাদেববাবু কর্মচারীটিকে মেসবাড়িতে গিয়ে টাকাটা ওদের ফেরত দিয়ে আসতে বললেন।

স্কেচ : সৌরভ মুখার্জী

কয়েকদিন পরের ঘটনা। বাড়ির সামনে পায়চারি করছি, এমন সময় দেখি ওই ছেলে তিনটি মেস থেকে বের হচ্ছে। এই সুযোগে আলাপ করার জন্য ওদের ডাকলাম। নানা কথার ফাঁকে জিজ্ঞেস করলাম সেদিন ওরা টাকাটা ফেরত পেয়েছিল কিনা। ওরা জানাল যে ৩ টাকা ফেরত পেয়েছে। ওদের কথা শোনার পর থেকেই একটা হিসেব কিছুতেই মেলাতে পারছি না। বন্ধুরা দেখতো মেলাতে পার কিনা?

কর্মচারীটি ওদের ৩ টাকা ফেরত দিয়েছে। তাহলে বাকি ২ টাকা কর্মচারীটির কাছে আছে। ওরা তিনজন ৩ টাকা ফেরত পেয়ে প্রত্যেকে ১ টাকা করে ভাগ করে নিয়েছে। তাহলে তিনজনের প্রত্যেকের স্টোভ কিনতে খরচ হল (৩০-১) টাকা = ২৯ টাকা।

এখন সমস্যা হল :

২৯ টাকা করে তিনজনের টাকা যোগ করলে হয় (২৯ × ৩) = ৮৭ টাকা। কর্মচারীটির কাছে আছে ২ টাকা। তাহলে হয় (৮৭ + ২) টাকা = ৮৯ টাকা। তাহলে আর ১ টাকা গেল কোথায়?

সমাধান :

ওরা তিনজনে স্টোভের দামের দেয় (৩০ × ৩) = ৯০ টাকা। মহাদেববাবু কর্মচারীটিকে দিয়ে ৫ টাকা ফেরত পাঠায়। অর্থাৎ, (৯০-৫) টাকা = ৮৫ টাকা মহাদেববাবুর কাছে আছে। ফেরত দেওয়া ৫ টাকা থেকে কর্মচারীটি নেয় ২ টাকা।

অর্থাৎ, মহাদেববাবু ও কর্মচারীটির কাছে মোট (৮৫ + ২) টাকা = ৮৭ টাকা আছে।

কর্মচারীটির কাছ থেকে ওরা তিনজন (ক্রেতাত্রয়) ফেরত পায় ৩ টাকা। ওরা প্রথমে প্রত্যেকে ৩০ টাকা করে খরচ করেছিল। পরে ১ টাকা পরে ফেরত পায়।

তাহলে ওদের তিনজনের প্রত্যেকের খরচ দাঁড়ায় (৩০-১) টাকা = ২৯ টাকা। ওদের তিনজনের খরচ করা ৮৭ টাকার মধ্যে মহাদেববাবু পেয়েছেন ৮৫ টাকা এবং কর্মচারীটি নিয়েছে ২ টাকা। সুতরাং এই ৮৭ টাকার সঙ্গে আবার ২ টাকা যোগ হবে কেন?

এই ধাঁধাটিতে হিসেব করার সময় ৮৭ টাকার সঙ্গে আবার ২ টাকা যোগ করাটাই বিভ্রান্তির কারণ।

E.mail : kbb.scwriter@gmail.com, M : 9433145112

হেমন্তবালা দেবীকে লেখা রবীন্দ্রনাথের চিঠি

('আবার বিচার' চিঠিপত্র, নবম খণ্ড, বিশ্বভারতী সংস্করণ ১৯৬৪ থেকে)

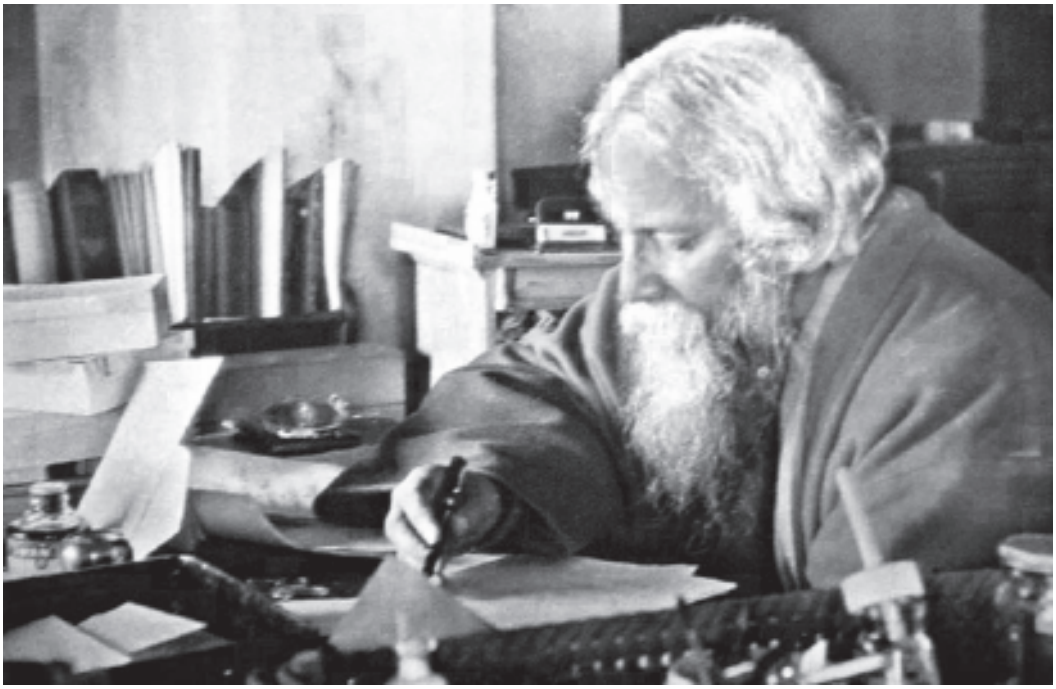

দার্জিলিং
১ নভেম্বর ১৯৩১

কল্যাণীয়াসু,

তোমার সঙ্গে আমার প্রথম কথাটা এই যে, লক্ষ যোজন দূরে কোন গ্রহ উপগ্রহ কোথাও বিশেষভাবে পরস্পর মুখ চাওয়াচাওয়ি করে আছে বলেই সকালবেলা উঠেই তোমার হাঁচি আরম্ভ হল, দুধ জ্বাল দিতে গিয়ে সেটা গেল পুড়ে, চোখের ডান পাতা কাঁপতে শুরু করল, বুঝতে পারলে আজ বাজার করতে পাঠালে বাজারদর যাবে চড়ে, কেননা রাহু দৃষ্টি দিচ্ছে তোমার বাজারের স্থানে, ওদিকে তোমার গ্রাম সম্পর্কে মাসতুতো বোনের ভাসুরপোকে তোমার দেওরের অন্নপ্রাশনে নিমন্ত্রণ করতে ভুলে গেছ বলে আত্মীয়বিচ্ছেদ হয়ে গেল, কেননা শনি ছিল তোমার নিমন্ত্রণ ফর্দ্দের উপর চেপে এসব কথা তোমার মন থেকে সরিয়ে দাও। কেন মনকে দুর্বল করো? সংসারে ছোট বড় অনেক অমঙ্গল আছে, বুদ্ধি নিয়ে বীর্য নিয়ে তার সঙ্গে লড়াই করতে হয়, কখনো হারি কখনো জিতি সংসারে এই নিয়ম। বিশেষ কারণে যখন অন্যমনস্ক থাকি তখন ডালে নুন দিতে পানে চুন দিতে ভুল হয়ে যায়— কেতু নামক পদার্থের উপর এর মূল দায়িত্ব চাপিয়ে কপালে করাঘাত করার মতো এত বড় দুর্বলতা আর কী হতে পারে। অথচ এদিকে সামান্য বাহ্য ব্যাপার সম্বন্ধে দেবতার কাছে অপরাধ হচ্ছে বলে মনকে পদে পদে পীড়িত করতে থাকো। গ্রহই যদি অপরাধ ঘটায় তবে দেবতার সঙ্গে অপদেবতার লড়াই হোক না কেন, মাঝের থেকে মানুষ কেন পায় শাস্তি? যদি বলো পুরুষকারের জোরে গ্রহফল খণ্ডন হয়, তাহলে গ্রহটাকে হিসাব থেকে বাদ দিয়ে রাখলেই তো পুরুষকার পুরো পরিমাণে জোর পেতে পারে। বিমানচারী অনধিগম্য শত্রুর বিভীষিকার ছায়ায় মনকে পদে পদে আচ্ছন্ন করে কেউ কি কখনো জীবনযাত্রায় জয়লাভ করতে পারে? দেখো চারিদিকে তোমার শত্রু আছে ম্যালেরিয়া, মূর্খতা, গোঁড়ামি, নিরুদ্যম, পরস্পর ঈর্ষা, কলহ, নিন্দুকতা, মূঢ়ের আত্মাভিমান, আরো কত কি-এর সঙ্গে প্রতিনিয়ত আমাদের যুদ্ধ করতে হবে বুদ্ধির দ্বারা সুবিবেচনার দ্বারা চরিত্রবলের দ্বারা এর উপরে পঞ্জিকাবিহারী শত্রুভয় আর বাড়াও কেন? যে দেশের হাড়ে মজ্জায় নানা আকারে ভয় ঢুকে চিত্তকে ঘুণে খাওয়া করে দিয়েছে— এমন সব ভয় যার অস্ত্র নেই, যেখানে যুক্তি পৌঁছয় না, সে দেশকে বাঁচাবে কে? আমাদের দেশে গ্রহ নক্ষত্রের সঙ্গে পরামর্শ করে শুভলগ্নে তো সকলেরই বিবাহ হয়, লগ্ন যে পদে পদে বিশ্বাসঘাতকতা করে তার হাজার প্রমাণ চারদিকেই। কিন্তু মূঢ়তার জোর কমে না। তর্ক করবার সময় বলে লগ্নফলের উপর স্ত্রী-পুরুষের ভাগ্যফল জড়িত আছে। শুধু স্ত্রী পুরুষ কেন, ভাই বোন, শ্বশুর শাশুড়ি, ভাবী সন্তান সকলেরই ভাগ্যফল বিজড়িত। তাই যদি হয় পাড়া প্রতিবেশী এবং দেশ-বিদেশের লোককে বাদ দেওয়া চলবে না। যে ইংরেজের ছেলে বাঁদর ভ্রম করে শিকার করতে গিয়ে বাঙালির ছেলেকে মেরেছে শুধু সেই নিহত ও হন্তারকের ভাগ্যফল গণনা করলে তো হবে না, ধরে নিতে হবে যে, সমস্ত ইংরেজ জাতি ও বাঙালি জাতির ভাগ্যফলে এবং যেদিন প্রথম বন্দুক সৃষ্টি হয়েছিল সেই দিনকার নক্ষত্রগুলি পরস্পরের প্রতি যা ভঙ্গী করেছিল তারি গুণে ব্যাপারটা ঘটতে পেরেছিল। তাছাড়া ভৃগুমুনি সব নক্ষত্র ও সব গ্রহ তাঁর হিসাবের মধ্যে আনেননি-সম্ভবও নয়, জানাও ছিল না। তারা কী বেকার বসে আছে? অতগুলো জ্বলন্ত দৃষ্টি হিন্দুসন্তানের ভাগ্যকে এড়িয়ে গেল কী করে? আর কেন? এসব জঞ্জাল নিয়ে মনকে হতবুদ্ধি অবসাদগ্রস্ত করে কী হবে।

১৫ই কার্ত্তিক ১৩৩৮

ইতি
দাদা

দাঁতন আর নয়

ড. সতী চক্রবর্তী

স্কেচ : সৌরভ মুখার্জী

টুথব্রাশ (Toothbrush) হল দাঁত ও মাড়ি পরিষ্কার রাখার এক যন্ত্র বিশেষ। সকালে ঘুম থেকে উঠে প্রথমেই হাতে ব্রাশ এবং রাত্রে ঘুম ঘুম চোখে হাতে সেই ব্রাশ। আমরা দাঁত ব্রাশ করি সতেজ ও আত্মবিশ্বাসী হওয়ার জন্যও বটে। মন্দ নিঃশ্বাসের থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার জন্য। সর্বোপরি একটি সুন্দর হাসি হাসবার জন্য নয় কি? দাঁত ব্রাশ করার কাজ ও উদ্দেশ্য হল দাঁতে প্লাক জমায় বাধাদান। দাঁতের খাঁজে আটকে থাকা খাদ্যাংশকে জমা থেকে মুক্ত করা ও দাঁত সংলগ্ন মাড়িকে রক্ষা করা।

বিজ্ঞানীরা ধাপে ধাপে এগিয়ে গিয়েছেন দাঁতে পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখার পদ্ধতির দিকে। দাঁতকে ঘষে মেজে পরিষ্কার রাখার জন্য নানা ভেষজ দিয়ে তৈরি হয়েছে নানা পাউডার। প্রথম দিকে দাঁত মাজার জন্য উনুনের ছাইও ব্যবহার করা হত। নিমের ডাল, বকুলের ডাল প্রভৃতি চিবিয়ে ব্রাশের মতো করে ব্যবহার করা হত। তাতে ব্রাশ ও পেস্টের, উভয় কাজ একসঙ্গে চলে যেত। প্রবাদ আছে— আম জাম নিমের ডালে / দাঁত মাজিও কুতুহলে। মাজনের পর টুথব্রাশ ও টুথপেস্ট এসেছে, দাঁত পরিষ্কার রাখার ক্ষেত্রে। নানা পরীক্ষা আজও চলছে। ব্রাশ ও পেস্টের গুণগত মান বাড়ানোর জন্য। দন্ত মার্জনার দ্বারা দাঁত পরিষ্কার থাকে। অপরিষ্কার দাঁতে ব্যাকটিরিয়ার উপস্থিতিতে প্লাক তৈরি হয়। কেরিস ও মাড়ির প্রদাহ (gingivitis) হয়। ক্রমশ পেরিওডন্টটাইটিসের (মাড়ির প্রদাহ) উৎপত্তি ঘটে। ফলে পেরিওডন্টাল লিগামেন্টের ক্ষতি হয়ে থাকে। অ্যালভিওলার হাড়ে ও মুখের অন্যান্য অংশে রোগ তৈরি হয়। প্লাক জমে জমে চমৎকার এক শক্ত স্তর দাঁতের ওপর জমে (চর্মের ক্ষেত্রে অবশ্য এমন ঘটে না)। সুতরাং নিয়মিত যারা সঠিকভাবে দাঁত ব্রাশ করে তাদের পক্ষে দাঁতের নানারকম সমস্যা থেকে মুক্ত হওয়া সম্ভব। নিয়মমাফিক ব্রাশ না করতে পারলে ফললাভ সম্ভব নয়। ফলপ্রসূ দাঁত ব্রাশ করা নির্ভর করে অভিপ্রায়, জ্ঞান ও হাতের যান্ত্রিক নৈপুণ্য বা পটুতার উপর। আর অবশ্যই গুরুত্বপূর্ণ হল উপযুক্ত টুথব্রাশ।

১৪৯৮ সালে তৈরি প্রথম টুথব্রাশ।

প্রথমে পশুলোম দিয়ে ব্রাশ তৈরি করা হয়েছিল চিন দেশে পঞ্চদশ শতকে। ব্রাশে কাঁটা বা কুচিগুলি সাইবেরিয়ান বরাহের ঘাড়ের কেশ নিয়ে গরু বা মোষের হাড়কে হ্যান্ডেল বানিয়ে তার মধ্যে খোদিত করে ওই কেশগুলি ন্যস্ত করা হত। আমেরিকা প্রথম এই রকম ব্রাশের পেটেন্ট গ্রহণ করে ১৮৫৭ সালে। ১৯৩৭-এ বরাহের কেশের (bristle tooth brush) পরিবর্তে নাইলনের ব্যবহার শুরু হয়। আজ বহু রকমের কার্যকরী ব্রাশ তৈরি হয়েছে এবং পাওয়া যায় দাঁত ব্রাশ করার জন্য। এই ব্রাশের মাথার দিকের আকার ডিম্বাকার, উপবৃত্তাকার বা গোলাকার অংশের মধ্যে সজ্জিত থাকে বাঁকাভাবে আন্দোলিত নাইলন গুচ্ছ যার হ্যান্ডেলটি নমনীয় হয়। নানারঙের ও বিশেষ বিশেষ মাপের ব্রাশ দেখা যায়। নাইলনের গুচ্ছও শক্ত, মাঝারি ও নরম ধরনের হয়। তবে কোন টুথব্রাশই দাবী করতে পারে না, সেই ব্রাশই শ্রেষ্ঠ; বেশির ভাগ সময়ে এটা নির্ভর করে ব্রাশ করার পদ্ধতির ওপর। ব্রাশের ডিজাইন অতটা বিবেচ্য নয়। গুরুত্বপূর্ণ হল ব্রাশের প্লাক দূর করার গুণমানের ওপর। ব্রাশ নির্বাচন করা যা নির্ভর করে প্রত্যেকের নিজের রুচি ও সুবিধার ওপর। জানা দরকার কখন কীভাবে দাঁত মাজতে হবে। হাতের সাহায্যে মাজার ব্রাশটির মাথা হবে ২৫.৪ মিমি থেকে ৩১.৮ মিমি লম্বা আর প্রস্থ হবে ৭.৯ মিমি থেকে ৯.৫ মিমি চওড়া। সামনের

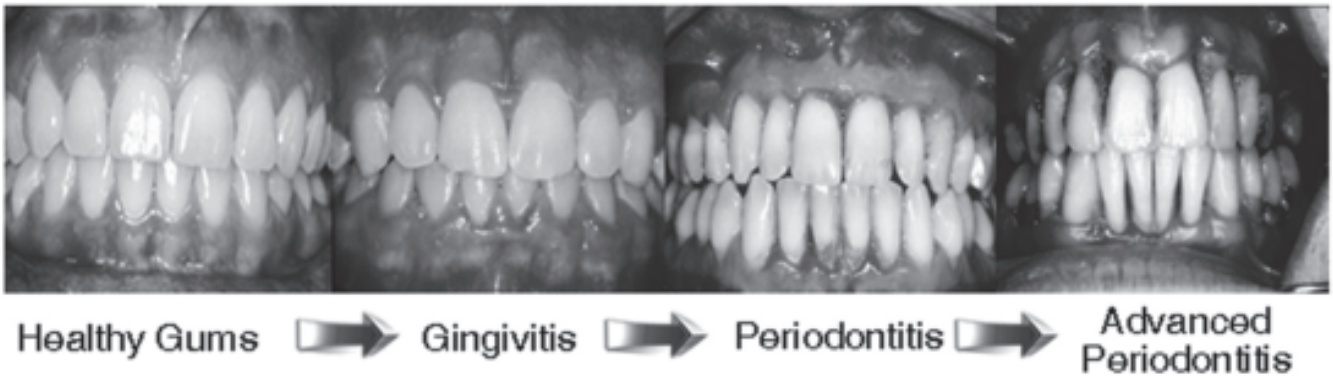

চওড়া অংশে তিন থেকে চারটি সারি আর অপরদিকে পাঁচ থেকে বারোটি সারিতে নাইলনের গুচ্ছ থাকে। ব্রাশ করার অন্যতম কার্যকরী পদ্ধতি হচ্ছে মৃদুভাবে (Bass technique) ব্রাশ করা। বাস পদ্ধতি

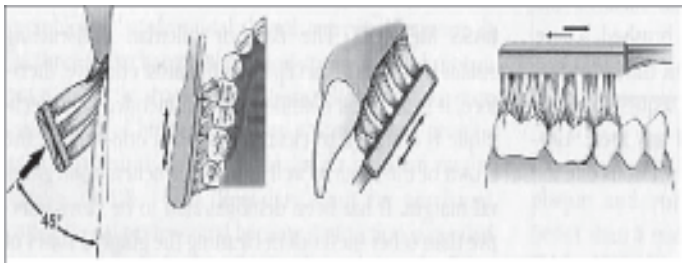

বাস পদ্ধতি

ব্যতীত আরও কয়েকটি পদ্ধতির উল্লেখ করা যেতে পারে। স্টিলম্যান্স পদ্ধতি (Stillman's method)— এই টেকনিকে আস্তে আস্তে মালিশের

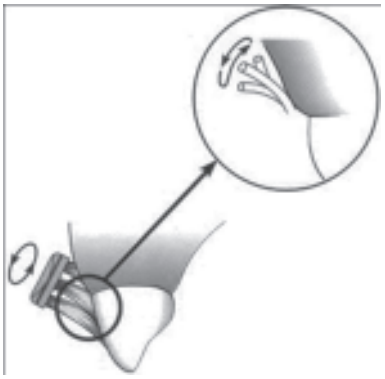

স্টিলম্যান্স পদ্ধতি

মতো ব্রাশ করলে উদ্দীপনা তৈরি হয় এবং এর ফলে দাঁতের সার্বিক পরিচ্ছন্নতা লাভ হয়। ফোনেস পদ্ধতিতে (Fone's Method) হালকা চাপ প্রয়োগে চক্রাকারে ম্যাক্সিলারি জিনজাইভা থেকে ম্যান্ডিবুলার

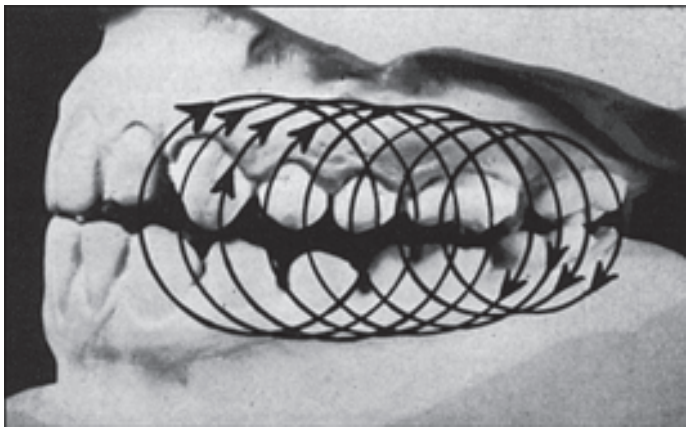

ফোনেস পদ্ধতি

জিনজাইভা পর্যন্ত ব্রাশ ব্যবহার করা হয়ে থাকে। লিওনার্ড পদ্ধতিতে (Leonard's method) আনুভূমিকভাবে ওপর থেকে নীচে এবং নীচে থেকে ওপরে। এইভাবে ব্রাশ চালনা করে দাঁত মাজা হয়ে থাকে। এছাড়া এই পদ্ধতির কোন দুটি বা তিনটি বিভিন্নভাবে একত্রিত করেও দাঁত মাজার কাজে ব্যবহার করা হয়ে থাকে। ব্রাশ করবার আদর্শ সময় হচ্ছে রাত্রে বিছানায় শুতে যাবার আগে। কারণ ঘুমের সময় মুখগহ্বরে

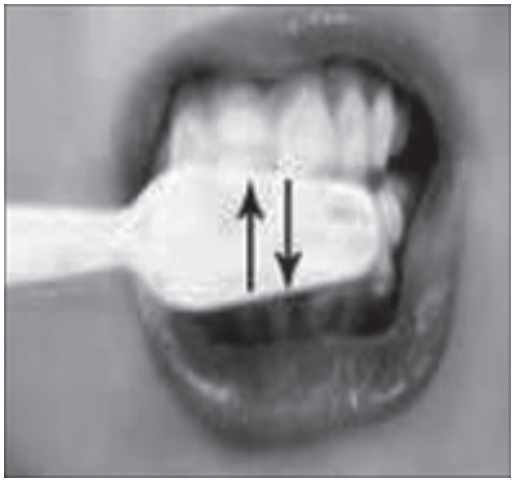

লিওনার্ডস পদ্ধতি

লালাক্ষরণ হ্রাস পায়, মুখবিবরস্থিত ব্যাকটিরিয়া খুব সহজে শর্করার সঙ্গে বিক্রিয়ায় প্রস্তুত অম্লের দ্বারা দাঁতে হানি ঘটায়।

নানাধরনের পাওয়ার্ড (Powered) বা ইলেকট্রিক্যাল (Electrical) ব্রাশের অন্তর্ভুক্তি এক নতুন ধরনের অভিজ্ঞতা। বাণিজ্যিকভাবে এটি বাজারে আসে ১৯৬০ সালে। এই ব্রাশ হাতে ধরে ব্রাশ করার বিকল্প হিসাবে বিবেচনা করা হয়। প্রতিবন্ধী, বৃদ্ধ, রোগী বা হাতের দুর্বলতাসম্পন্ন মানুষের জন্য। ইদানীং পাওয়ার্ড ব্রাশের ব্যবহারের সমর্থন বৃদ্ধি পেয়েছে। দাঁতের প্লাক দূর করার জন্য পাওয়ার্ড টুথব্রাশের সঙ্গে দাঁতের

যান্ত্রিক সংযোগ নির্ভর করে।

অনেক ধরনের ইলেকট্রিক্যাল ব্রাশ আজকাল বাজারে সহজলভ্য। এটা দুপিঠেই কাজ করে। বৃত্তাকার গতিতে কাজ করে। পর্যায়ক্রমিক বিপরীত দিকে, গোলভাবে নড়াচড়া করতে পারে। এমনকি নিম্নহারের শব্দতরঙ্গ সৃষ্টি করে, এই চলমান স্পন্দন দাঁতের ওপরের ব্যাকটিরিয়া প্লাকের সঙ্গে সংঘর্ষ বাধায়। এই ব্রাশগুলি আশীর্বাদস্বরূপ কারণ অনেকেই অতি উৎসাহী হয়ে জোরে ব্রাশ করে দাঁতের ক্ষতি করে ফেলে। অপরপক্ষে পাওয়ার্ড ব্রাশ কৌণিক লম্বা, ছোটমাথা পিছন দিক খুব ভালো পরিষ্কার করতে সক্ষম। তাছাড়া ব্রাশের হালকা আঘাত যা দাঁতের প্লাককে উপযুক্তভাবে দূর করতে পারে। কখনও কখনও এই ব্রাশে টাইমার লাগানো থাকে। এই সিগন্যাল বা সংকেতরশ্মি ২-৩ মিনিটের মত কম সময়ে দাঁত পরিষ্কার করে। এর দ্বারা দাঁত মাজার সময়কে নিয়ন্ত্রণে রাখা যায়। এটি একটি সম্পূর্ণ হাইটেক অভিজ্ঞতা।

যোগাযোগ : 39/1 Indrani Park, Kolkata-33,
M : 9830744340

ডাঃ সুভাষ মুখোপাধ্যায়

রাজদীপ ভট্টাচার্য্য

পূর্ববর্তী সংখ্যার পর...

ইতিমধ্যে সুভাষবাবু তাঁর এই সাফল্যের কথা বিবৃত করলেন Indian Journal of Cryogenics পত্রিকায়। ১৯৭৮ সালে Hormonal Steroids এর পঞ্চম আন্তর্জাতিক সম্মেলন হয় দিল্লিতে। সেখানে নিজের আবিষ্কারের কথা তথ্য সহযোগে তুলে ধরেন ডা. সুভাষ

সম্মেলনে আলোচনারত : ডাঃ সুনীত মুখার্জী (বাঁদিকে), ডাঃ সুভাষ মুখার্জী (মাঝে), এবং ডাঃ ডেরেক গুপ্ত (ডানদিকে)

মুখোপাধ্যায়। ১৯৭৯ সালের জানুয়ারি মাসে হায়দ্রাবাদে ভারতীয় সায়েন্স কংগ্রেসের প্রাঙ্গণেও একইভাবে ভারতবর্ষের প্রথম টেস্ট টিউব বেবির জন্মবৃত্তান্ত মেলে ধরেন সকলের সম্মুখে। সেই সময়ে এই বিষয়ে গবেষণারত বিশ্বের বিভিন্ন বিশিষ্ট মানুষজন যেমন হাভার্ড মেডিকেল স্কুলের ল্যাবরেটরি অফ হিউম্যান রিপ্রোডাকসন-এর অধ্যাপক জন বিগার্স, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের কর্নেল ইউনিভার্সিটির বায়ো-কেমিস্ট্রি ও এন্ড্রোক্রিনোলজি বিভাগের অধ্যাপক বি. বি. সাক্সেনা, হাভার্ডের গায়নোকলজি বিভাগের অধ্যাপক কেনেথ রায়ান প্রমুখের সাথে নিজের কাজ নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন সুভাষ মুখোপাধ্যায়। বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তাঁকে ভ্রূণ সংস্থাপন বিষয়ে বক্তব্য রাখার জন্য আমন্ত্রণ জানানো হয়। গুয়াহাটি অবস্টেট্রিকাল অ্যান্ড গায়নোকজিক্যাল সোসাইটি'র তত্ত্বাবধানে গুয়াহাটি মেডিকেল কলেজে ড. মুখোপাধ্যায়কে মানপত্র প্রদানের মাধ্যমে সম্মাননা জানানো হয়।

এই সময়ে ১৯৭৮ সালের ১৮ই নভেম্বর তৎকালীন বামফ্রন্ট সরকার সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের এই আবিষ্কার বিষয়ে স্পষ্ট সিদ্ধান্তে পৌঁছানোর উদ্দেশ্যে একটি তদন্ত কমিটির কথা ঘোষণা করেন। এর নেতৃত্বে থাকেন রেডিওফিজিক্স-এর এক ব্যক্তিত্ব। সহযোগিতায় একজন গায়নোকোলজিস্ট, একজন ফিজিওলজিস্ট এবং একজন নিউরোফিজিওলজিস্ট।

কষ্টিপাথরে যাচাই করা শুরু হয় সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের যুগান্তকারী সাফল্যকে। চিকিৎসা-বিজ্ঞানের আধুনিকতম অগ্রগতির বিচারে কূপমণ্ডুক কিছু মানুষ বিচারাসনে বসলে তদন্তের ফলাফল যা হওয়া উচিত তাই হয়। বিচারকদের একজন প্রশ্ন করেন মানবশরীর থেকে সংগৃহীত ভ্রূণ আপনি কোথায় রেখেছিলেন? ড. মুখোপাধ্যায় বলেন, 'সিল করা অ্যাম্পুলের মধ্যে'। পুনরায় প্রশ্ন ভেসে আসে 'অ্যাম্পুলগুলো কিভাবে সিল করলেন?' সুভাষবাবু বলেন, 'তাপের সাহায্যে যেমনভাবে করা হয়।' সর্বজ্ঞানী বিচারক প্রশ্ন করেন, 'সেকি, তাপের সাহায্যে সিল করার সময় ভ্রূণ মরে যায় না!' এই কথোপকথনের পরে বিশেষজ্ঞ কমিটির বিশেষ জ্ঞান সম্পর্কে অধিক মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন।

সুভাষ মুখোপাধ্যায় ইতিমধ্যে বার বার বলেছেন যে জন্মের পরে সাধারণ বেবি এবং টেস্ট টিউব বেবির মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ করার কোন উপায় নেই। একমাত্র যদি কোন সারোগেট মা-এর গর্ভে সন্তানের জন্ম হয় তবে জিন পরীক্ষার মাধ্যমে প্রকৃত পিতামাতার সাথে সন্তানের সম্পর্ক প্রমাণ করা সম্ভব। তাছাড়া সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের এই সাফল্য তাঁর ব্যক্তিগত গবেষণার সুফল। তাই তিনি সম্পূর্ণ ঘটনার প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত বিভিন্ন পর্যায়ের তথ্যসমূহ উপযুক্ত পদ্ধতিতে সংরক্ষিত রাখেননি। কিন্তু তাঁর এই কর্মকাণ্ডের বিবরণ, প্রক্রিয়াগত অগ্রগতি ইত্যাদি সকল কিছুই তিনি তদন্ত কমিটির সামনে রাখেন। কিন্তু যে তদন্ত কমিটির সদস্যদের আধুনিক বংশগতিবিদ্যা বিষয়ে সম্যক ধারণা নেই তাদের কাছে এই সকল প্রমাণ অপ্রয়োজনীয়। কমিটি রায় দেয় 'Everything that Dr. Mukhopadhyay claims is bogus'।

তদন্ত কমিটির এই সিদ্ধান্তকে বিবেচনা করার পূর্বে কয়েকটি বিষয় বুঝে নেওয়া দরকার। প্রথমত, সুভাষবাবু তাঁর এই সাফল্যের কথা চিকিৎসা সংগঠন বা সরকারের কাছে নিবেদন না করে প্রকাশ করেছিলেন মিডিয়ার মাধ্যমে। দ্বিতীয়ত, তদানীন্তন স্বনামধন্য চিকিৎসকেরা সুভাষবাবুর মত নবীন গবেষককে এত বড় সাফল্যের কারিগর রূপে মেনে নিতে বড় কষ্ট পেয়েছিলেন। তৃতীয়ত, তৎকালীন বামপন্থী সরকারের গগনস্পর্শী ব্যক্তিত্বের সামনে সুভাষবাবুর মত নগণ্য মানুষের মাথা উঁচু করে চোখে চোখ রেখে কথা বলা বোধহয় সহ্য হয়নি আমলা ও নেতাদের। চতুর্থত, টি. সি. আনন্দকুমার (১৬ আগস্ট, ১৯৮৬ সালে ভারতের পরবর্তী টেস্ট টিউব বেবি 'হর্ষ' এর বৈজ্ঞানিক জনক) পরবর্তীকালে ঐ তদন্ত কমিটির বিচারকদের 'alien' বলে অভিহিত করেন। অর্থাৎ সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের সাফল্য-ব্যর্থতা বিচারের ক্ষেত্রে বিচারকদের অজ্ঞতা, অযোগ্যতা ভিনগ্রহের বাসিন্দাদেরও সমান ছিল—এমনটাই তিনি বলেছিলেন। পঞ্চমত, বিচারকমণ্ডলী এবং তৎকালীন চিকিৎসক সমাজ ভাবতেই পারেননি যে এই কলকাতা শহরে সাউদার্ন অ্যাভিনু'র ফ্ল্যাটে বসে সাধারণ একটি রেফ্রিজারেটর ও সামান্য কিছু যন্ত্রপাতির সাহায্যে এতবড় সাফল্যের চাবিকাঠি ছুঁয়ে ফেলা যায়।

তাই ফলাফল যা হওয়ার তাই হল। পশ্চিমবঙ্গ সরকার ড. সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের এই সাফল্যের দাবিকে নাকচ করে দিল। এই অবধি এসে বিষয়টা থেমে থাকলে হয়তো পরবর্তী পরিস্থিতি অন্যরকম হত। কিন্তু সরকারি রোষানল থেকে বাঁচতে পারলেন না সুভাষ বাবু। তাঁকে অবিলম্বে বদলি করে দেওয়া হল বাঁকুড়া সম্মিলনী মেডিকেল কলেজে।

ব্যক্তিগত জীবনে বার বার মিথ্যাচারের অভিযোগে অপমানিত হতে হল তাঁকে। ১৯৮০ সালে একবার হার্ট অ্যাটাক হল সুভাষবাবুর। জাপানের কিয়োটো শহরে IVF বা In-Vitro Fertilization সম্পর্কে বক্তব্য রাখার জন্য আমন্ত্রণ পেলেন তিনি। কিন্তু রাজ্যসরকারী হস্তক্ষেপে সুভাষবাবুর গতিবিধি নির্দিষ্ট করা হল, জাপান যাওয়ার অনুমতি পেলেন না তিনি। পরে এই প্রসঙ্গে তৎকালীন স্বাস্থ্যমন্ত্রী ননী ভট্টাচার্য্য বলেছিলেন যে 'জনগণের স্বার্থে' (Public Interest) এরূপ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল। আর সবশেষে সুভাষবাবুর ভবিষ্যৎ গবেষণার পথ রুদ্ধ করে দেওয়ার জন্য ১৯৮১ সালে কলকাতা মেডিকেল কলেজের চক্ষুবিভাগে (Institute of Opthalmology) ইলেকট্রোফিজিওলজির অধ্যাপক রূপে স্থানান্তরিত করা হল তাঁকে।

একজন চাষীর হাত থেকে লাঙল, একজন শ্রমিকের হাত থেকে হাতুড়ি কিংবা একজন ফুটবলারের পা থেকে বল কেড়ে নিলে যা হয়। একজন চিকিৎসক-গবেষকের কাছ থেকে আপন পথে চিকিৎসা ও গবেষণার ন্যূনতম সুযোগ কেড়ে নেওয়ার ফলশ্রুতি ঠিক তাই হল। তাঁর সহযোগী ডা. সুনীত মুখোপাধ্যায় পরবর্তীকালে বলেছিলেন যে তাঁরা সুভাষবাবুকে কলকাতার বাইরে চলে যাওয়ার কথা বলেছিলেন। কিন্তু এত রোগী, এত সমস্যা এবং তা নিয়ে গবেষণার সুযোগ কলকাতার বাইরে আর পাওয়া যাবে না; এই কথা ভেবেই সুভাষবাবু কলকাতা ত্যাগ করেননি। এই কাজ ও গবেষণা পাগল মানুষটি নিজের স্ত্রী নমিতা দেবীকে বারংবার বুঝিয়েছিলেন বৃহত্তর স্বার্থে তাঁদের মাঝে কোন সন্তান না আনার জন্য, যাতে গবেষণার কাজ ব্যাহত না হয়। এরকম একজন মানুষের কাছ থেকে সব হাতিয়ার কেড়ে নেওয়ার অর্থ তাঁর জীবনকে নিরর্থক করে দেওয়া। সুভাষবাবুর কাছে তাঁর দৈনন্দিন জীবনযাপন হয়ে উঠল একটা একটা করে দিন মৃত্যুর জন্য অপেক্ষা করা মাত্র।

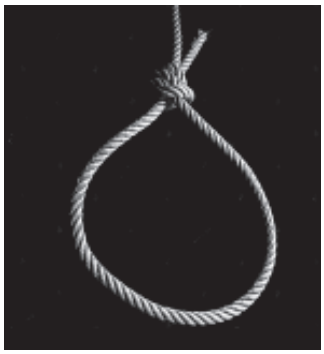

১৯শে জুন, ১৯৮১ শিক্ষয়িত্রী স্ত্রী নমিতা মুখোপাধ্যায় স্কুল থেকে ফিরে কলকাতার সাউদার্ন পার্কের ছয়তলার ফ্ল্যাটে আবিষ্কার করলেন এক বরেণ্য বিজ্ঞানীর ঝুলন্ত মৃতদেহ। সুইসাইড নোটে লেখা ছিল, 'I can't wait everyday for a heart attack to kill me.'

E-mail : rajdip5678@gmail.com ● M. 9836569850

পরবর্তী সংখ্যায় সমাপ্য

সংবাদ

প্রকৃতি পর্যবেক্ষণ শিবির

ছবি: সৌরভ মুখার্জী

বিজ্ঞান দরবার আয়োজিত ৪র্থ বার্ষিক প্রকৃতি পর্যবেক্ষণ শিবির ২১ ও ২২ জানুয়ারি রিভার রিসার্চ ইনস্টিটিউট ক্যাম্পাস, মোহনপুর নদিয়াতে অনুষ্ঠিত হয়।

২১ জানুয়ারি টেলিস্কোপের সাহায্যে রাতের আকাশ পর্যবেক্ষণ করা হয়। স্থানীয় বিভিন্ন স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীরা অত্যন্ত আগ্রহের সঙ্গে অংশগ্রহণ করে। অডিটোরিয়ামে মহাকাশ, পরিবেশ বিষয়ে আলোকচিত্র প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করা হয়।

২২ জানুয়ারি সকালে গাছপালা, পাখি ও পোকামাকড় পর্যবেক্ষণ করা হয়। এরপর দুপুর ২-৩০ থেকে 'মহাবিশ্বের রহস্য' শীর্ষক আলোকচিত্রসহ বক্তব্য রাখেন বিশিষ্ট বিজ্ঞানী ডা. শঙ্কর কুমার নাথ।

পরিবেশ বান্ধব মঞ্চ, বারাকপুরের বর্ষপূর্তি অনুষ্ঠান

ছবি: কল্লোল রায়

২৮ ও ২৯ জানুয়ারি পরিবেশ বান্ধব মঞ্চ, বারাকপুর এর উদ্যোগে এক পরিবেশ সচেতনতা বিষয়ক কর্মশালা, মডেল, প্রজেক্ট, চার্ট প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়।

জাতীয় বিজ্ঞান দিবস উদ্‌যাপন

বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ ও পিপলস অ্যাসোসিয়েশন ফর সায়েন্স এন্ড এনভায়রনমেন্ট যৌথভাবে ২৮ ফেব্রুয়ারি বিজ্ঞানীদের মুখোমুখি অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে জাতীয় বিজ্ঞান দিবস উদ্‌যাপন করল কলকাতা বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের সভাঘরে। বিজ্ঞানের নানা প্রশ্নের জবাব দিলেন উপস্থিত নামকরা বিজ্ঞানীরা।

সাথিদের হত্যায় গাছেরা সন্ত্রস্ত

ছবি: জলপাইগুড়ি সায়েন্স অ্যান্ড নেচার ক্লাব

গোরুমারা জাতীয় উদ্যানের লাটাগুড়ি নেওড়ায় রেললাইনে উড়ালপুল তৈরির জন্য বন দপ্তর বেআইনি ভাবে প্রায় ১০০০ গাছ কেটেছে বলে দাবি করেছেন পরিবেশ প্রেমীদের যৌথমঞ্চ। যানচলাচল বন্ধ রেখে এই গাছ কাটা হয়েছে। হাইকোর্ট গাছ কাটার বিরুদ্ধে স্থগিতাদেশ দিয়েছে। গ্রিন ট্রাইবুনাল নির্দেশ দিয়েছেন ১৬ মে পর্যন্ত লাটাগুড়িতে আর কোন গাছ কাটা যাবে না। কোর্ট এ বিষয়ে রেল, কেন্দ্রীয় বন ও পরিবেশ দপ্তর ও জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষকে তলব করেছে।

ইতিমধ্যে জলপাইগুড়ি সায়েন্স এন্ড নেচার ক্লাব পরিবেশ প্রেমীদের যৌথমঞ্চ সহ সর্বস্তরের পরিবেশ কর্মীরা এর বিরুদ্ধে আন্দোলনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। লাটাগুড়ির স্থানীয় বাসিন্দারা গাছ রক্ষায় রাতদিন গণপ্রতিরোধ চালিয়ে যাচ্ছে।

বিশ্ব জলাভূমি দিবস উদ্‌যাপন

বিজ্ঞান দরবার, কাঁচরাপাড়া, চাকদহ বিজ্ঞান ও সাংস্কৃতিক সংস্থা, কোচবিহার বিজ্ঞান চেতনা ফোরাম ও জলপাইগুড়ি সায়েন্স এন্ড নেচার ক্লাব যৌথভাবে ২ ফেব্রুয়ারি বিশ্ব জলাভূমি দিবস উদ্‌যাপন করেন।

জলাতঙ্ক রোগে সাবধানতা ও তার প্রতিকার

পি.আর.সি. (বীজপুর) ও কাঁচরাপাড়া বিজ্ঞান দরবারের উদ্যোগে ২ এপ্রিল জলাতঙ্ক রোগে সাবধানতা ও তার প্রতিকার শীর্ষক এক আলোচনা সভা হালিশহর রামপ্রসাদ বিদ্যাপীঠ হাইস্কুলে আয়োজন করা হয়। বক্তা ডা. সুজিত দাস আলোকচিত্র ও বিভিন্ন তথ্যসহযোগে জলাতঙ্ক রোগ নিয়ে বিস্তারিত বক্তব্য রাখেন। ডা. দাস জলাতঙ্ক রোগে মৃত্যুর সংখ্যা কমানোর জন্য বিজ্ঞান ভিত্তিক বহু তথ্য উল্লেখ করেন। জানা গেল, কুকুর কামড়ালে ক্ষতস্থানে ১৫ মিনিট ধরে জলস্রোত প্রবাহিত করা উচিত। এবং ক্ষতস্থানে কোন ব্যান্ডেজ করা উচিত নয়। অবশ্যই ভ্যাকসিন নিতে হবে।

যশোহর রোডে গাছ কাটার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ

৩৫ নম্বর জাতীয় সড়ক (যশোহর রোড) চওড়া করার জন্য প্রায় ৪০০০ গাছ কাটার বিরুদ্ধে গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষা সমিতি হাইকোর্টে জনস্বার্থ মামলা করেছেন। বিচারপতি সরকারের কাছে জানতে চান গাছ বাঁচিয়ে কিভাবে এগোনো সম্ভব। আইনজীবি রঘুনাথ চক্রবর্তী জানান পেট্রাপোল সীমান্তে জয়ন্তীপুরে মাঝখানে গাছ রেখে দুদিকে লেন চলে গিয়েছে। বিকল্প মডেল রয়েছে তাই গাছ না কেটে উন্নয়ন সম্ভব।

এভাবে গাছ কাটার বিরুদ্ধে বনগাঁও কলেজের ছাত্রছাত্রীরা ১৩ এপ্রিল কয়েকশো চারাগাছ পুঁতে গাছ কাটার প্রতিবাদের চিহ্ন রাখেন। পাশাপাশি গাছ কাটার প্রতিবাদে কয়েকশো মানুষ মোমবাতি মিছিল করেন।

কোচবিহারে লিটল ম্যাগাজিন মেলায় অংশগ্রহণ

ছবি: কোচবিহার বিজ্ঞান চেতনা ফোরাম

তোর্ষা সাহিত্য সংস্থা আয়োজিত ৪ ও ৫ মার্চ ২০১৭ কোচবিহার রাসমেলা মাঠে লিটল ম্যাগাজিন মেলায় বিজ্ঞান অন্বেষক ও কোচবিহার বিজ্ঞান চেতনা ফোরাম অংশগ্রহণ করে। ৫ মার্চ কোচবিহার বিজ্ঞান চেতনা ফোরামের উদ্যোগে বিজ্ঞান আন্দোলনের বিভিন্ন দিক নিয়ে এক আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। সভায় জেলার বিভিন্ন বিজ্ঞান কর্মীরা মতামত রাখেন। ড. অমিতাভ চক্রবর্তী সভা পরিচালনা করেন।

পত্রিকা যোগাযোগ

চাকদহ বিজ্ঞান ও সাংস্কৃতিক সংস্থা	M. 9332283356
জলপাইগুড়ি সায়েন্স অ্যান্ড নেচার ক্লাব	M. 9232387401
প্রতাপদীঘি লোকবিজ্ঞান সংস্থা	M. 9732681106
কলকাতা বিজ্ঞান ও সাংস্কৃতিক সংস্থা	M. 9477589456
তপন চন্দ, মাদারীহাট, আলিপুরদুয়ার	M. 9733153661
কোচবিহার বিজ্ঞান চেতনা ফোরাম	M. 9434686749
গোবরডাঙা গবেষণা পরিষৎ	M. 9593866569

ট্রাপিস্ট-১ : নতুন পৃথিবী?

রতন দেবনাথ

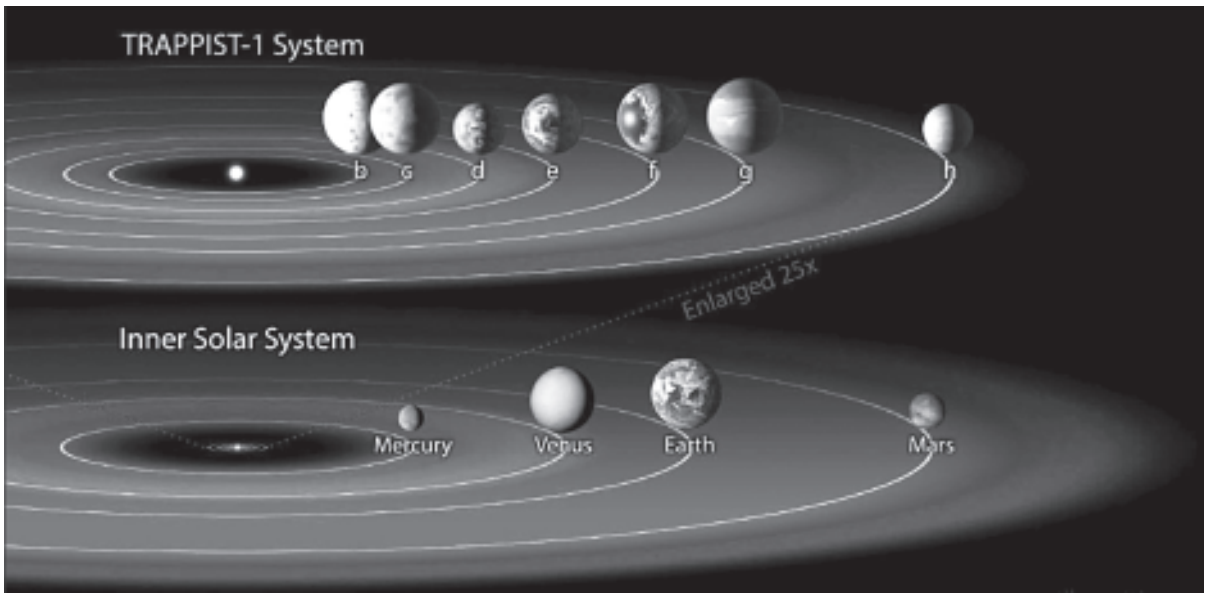

এই মহাবিশ্বে আমরা কী নিঃসঙ্গ? প্রশ্নটা বিজ্ঞানীদের মনকে নাড়া দেয় প্রতিনিয়ত। উত্তর খুঁজতে ব্যস্ত তাঁরা। আমাদেরই মতো কোনো পৃথিবী, পৃথিবীতে থাকা গাছপালা, পশুপাখী, মায় মানুষ যদি কোথাও থাকত তাহলে কী মজাটাই না হত? বাড়ানো যেত বন্ধুত্বের হাত। জানা যেত তাদের ভাষা, সংস্কৃতি, আদব-কায়দা। এ নিয়ে বিজ্ঞানীদের কৌতূহল যুগ যুগ ধরে। কৌতূহলকে সম্বল করে বিজ্ঞানী, বিশেষ করে জ্যোতির্বিজ্ঞানীর দল আকাশ খুঁজে বার করতে ব্যস্ত আরেকটা পৃথিবী।

সম্প্রতি আকাশ খুঁজে পাওয়া গেছে এরকম একটি জগৎ যেখানে একটি নক্ষত্রকে ঘিরে সাতটি ছোট ছোট গ্রহ তার চারপাশে ঘুরছে। আমেরিকার ন্যাশনাল অ্যারোনটিকস অ্যান্ড স্পেস অ্যাডমিনিস্ট্রেসনের (NASA) 'স্পিৎজার স্পেস টেলিস্কোপ' পৃথিবী থেকে প্রায় চল্লিশ আলোকবর্ষ দূরে আকুয়ারিশ নক্ষত্রমন্ডলে সন্ধান পেয়েছে গ্রহজগৎটির। নাম দেওয়া হয়েছে ট্রাপিস্ট-১ (Trappist-1), চিলি-র The Transiting Planets and Planetesimals Small Telescope-এর সংক্ষিপ্ত রূপ। সাতটি প্রায় পৃথিবীর সমান আকারের গ্রহগুলির মধ্যে তিনটি গ্রহ তাদের নক্ষত্রটি থেকে এমন দূরত্বে রয়েছে যে সেগুলি প্রায় বাসযোগ্য বলে ধারণা করা হচ্ছে। এদের পাথুরে গঠনে জল তরল অবস্থায় থাকবার সম্ভাবনা প্রবল।

ট্রাপিস্ট-১-এর গঠন কেমন? ট্রাপিস্ট-১-এর গ্রহগুলো আমাদের সৌরজগতের গ্রহগুলোর মত সুদূর বিস্তৃত নয়। এখানে গ্রহগুলো খুব অল্প বিস্তারে তাদের নক্ষত্রকে ঘিরে তার চারপাশে ঘুরছে। আমাদের সূর্য থেকে বুধ গ্রহটি যে দূরত্বে রয়েছে ট্রাপিস্ট-এ নক্ষত্রটিকে ঘিরে সবগুলো গ্রহ প্রায় ততটা দূরত্বের মধ্যে থেকে বিভিন্ন কক্ষপথে ঘুরছে। গ্রহগুলো সেখানে এতটাই কাছাকাছি যে একটি গ্রহে দাঁড়িয়ে অন্য গ্রহে উঁকি মারলে ভিনগ্রহের পৃষ্ঠতলের ছবি মালুম হবে। পৃথিবী থেকে চাঁদকে যতটা বড় দেখতে লাগে ওখানে এক গ্রহ থেকে আরেক গ্রহকে তার চেয়েও বড় দেখাবে।

ট্রাপিস্ট-এর গ্রহগুলোর একটা দিকই সবসময় নক্ষত্রটির দিকে মুখ করে আছে। এর অর্থ হল গ্রহগুলোর একদিকে সবসময়ই দিন আরেক দিকে সবসময় রাত্রি। ঠিক আমাদের পৃথিবীর মতো নয়, যেখানে কমবেশি বারো ঘণ্টা দিন বারো ঘণ্টা রাত্রি। আবহাওয়াও আমাদের এখানকার মতো হওয়া স্বাভাবিক নয়। গ্রহগুলোর আবর্তন কাল অর্থাৎ নক্ষত্রের চারপাশে একবার ঘুরে আসতে সময়ও নেয় খুব কম। গ্রহভেদে প্রায় দেড় দিন থেকে কুড়ি দিন সময় লাগে নক্ষত্রটির চারপাশে একবার ঘুরে আসতে।

যে নক্ষত্রটিকে ঘিরে ট্রাপিস্ট-১-এ গ্রহগুলো ঘুরছে উষ্ণতার দিক থেকে সেটি কিন্তু মোটেও আমাদের সূর্যের মতো নয়। বিজ্ঞানীদের অনুমান ওর তাপমাত্রা আমাদের সূর্যের চেয়ে অনেক অনেক কম। আর তাপমাত্রা এতটা কম হওয়ার কারণে ওর কাছে থাকা গ্রহটির পৃষ্ঠে জল তরল অবস্থায় থাকলেও অসুবিধা নেই। আর ওর আকার? সূর্যের আকারের আট শতাংশের কাছাকাছি হবে বলে আন্দাজ।

চোদ্দ বছর ধরে আকাশ পরিক্রমা করে ইনফ্রারেড টেলিস্কোপ স্পিৎজার ২০১৬ সালে ট্রাপিস্ট-১ কে একাদিক্রমে প্রায় পাঁচশো ঘণ্টা ধরে পর্যবেক্ষণ করে খুঁটিনাটি তথ্য সংগ্রহ করেছে। স্পিৎজারের দোসর হিসাবে হাবল্ স্পেস টেলিস্কোপ, কেপলার স্পেস টেলিস্কোপ ইত্যাদিকেও কাজে লাগানো হয়েছে। হাবল্ স্পেস টেলিস্কোপ গ্রহগুলোর গ্যাসীয় গঠন সম্বন্ধে ধারনা নিচ্ছে। ২০১৬ সালের মে মাসে হাবল্ ট্রাপিস্ট-১-এর একদম ভিতরের দুটি গ্রহকে পুঙ্খানুপুঙ্খ পর্যবেক্ষণ করেও গ্রহ দুটির গ্যাসীয় গঠনের কোনো ইঙ্গিত পায়নি। এর থেকে অনুমান করা হয় যে গ্রহগুলোর গঠন পাথুরে। তরল জল থাকাও অসম্ভব নয়। তবে যাচাইয়ের শেষ এখানেই নয়। আগামী ২০১৮ সালে NASA, জেমস্ ওয়েব স্পেস টেলিস্কোপ-এর সাহায্যে যাচাই করে দেখবে গ্রহগুলোর রাসায়নিক গঠন। আরও সূক্ষ্ম ভাবে যাচাই করে দেখবে সেখানকার বাতাবরণ। জল, মিথেন, অক্সিজেন, ওজোন ইত্যাদি কী পরিমাণে রয়েছে সেখানে। এছাড়াও সেখানকার তাপমাত্রা, চাপ ইত্যাদি বসবাসের যোগ্য কিনা। তবেই ঠিক হবে বন্ধু গ্রহ পাওয়া গেল কিনা।

E.mail : rdebnath1961@gmail.com, M : 9477934928

ADMISSION OPEN

Session : 2017-18

Kanchrapara Albatross School

Play group to class-viii
digi school
new building
Ph. 8013191616
03325856660

Dulux
Let's colour

NEROLAC
HEALTHY HOME PAINTS

Authorised Dealer :

SUBINOY PAUL

M. 9231545191
Workshop Road : Kanchrapara, North 24 Pgs.

সৌজন্যে :

BUNTI TRADERS
&
ORDER SUPPLIERS

Halisahar, Khasbati, North 24 Parganas

ALL PAINTS DEALER

With Best Compliments :

M/S SAHA ENTERPRISE

(Govt. Contractor & General Order Supplier)

Prop. Nitai Saha

Vill & P.O. Simhat
District : Nadia
PIN : 741249
Mobile : 9732552485

জানো কি?

বিজয় সরকার

❑ সাত দিনে কেন এক সপ্তাহ?

জ্যোতির্বিজ্ঞানের নিয়ম মেনে দিন, মাস ও বছরের সময়কাল নির্ধারিত হয়। সূর্য ও চাঁদের পরিক্রমণ এগুলি মেনে চলে। কিন্তু সাত দিনে কেন এক সপ্তাহ এর পেছনে কোনও বিজ্ঞান নেই।

ব্যাবিলনবাসীরা প্রথম সাত দিনে সপ্তাহ চালু করেন। এর কারণ ছিল তাদের আরাধ্য সাতজন দেবতার পুজো সপ্তাহে একদিন তারা করত। আধুনিককালের সাত-দিনে সপ্তাহের সূচনা হয় খ্রিস্টান সমাজের প্রসারের হাত ধরে। খ্রিস্টধর্ম মতে ঈশ্বর ছয় দিন ধরে পৃথিবী সৃষ্টি করেন, সপ্তম দিনে তিনি বিশ্রাম নেন। এই সপ্তম দিনটিকে বলা হয় সাবাথ (Sabbath)। ইহুদী ও রোমানদের সাবাথের দিনটি হল শনিবার। রোমানরা মনে করে, শনিগ্রহ দ্বারা শাসিত শনিবার হল একটি অপয়া দিন, ফলে ওই দিনে কোন কাজ নয়, বিশ্রাম নাও।

❑ সমস্ত মানচিত্রের উপরের অংশ কেন উত্তর দিক হিসেবে চিহ্নিত?

দেওয়ালে টাঙানো বা বইয়ের পাতায় ছাপা সমস্ত মানচিত্রের উপর অংশ হল উত্তর দিক। ভারতের মানচিত্রে কাশ্মীর রাজ্যকে সব সময় উপর দিকেই দেখি। এই রীতির পেছনে কিন্তু কোন বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা নেই। মানচিত্র আঁকার আদিকাল থেকেই এই রীতি চলে আসছে।

ইজিপ্টের (মিশর) বিজ্ঞানী টলেমি প্রথম মানচিত্র তৈরি করেন। তিনি বিশ্বাস করতেন যে ইজিপ্ট অবস্থিত পৃথিবীর ঠিক মাঝখানে। সেই সময় ইজিপ্টের সঙ্গে ভূমধ্য সাগরীয় অঞ্চল ও গ্রীসের খুব ভাল সম্পর্ক ছিল, যার অবস্থান ছিল ইজিপ্টের উত্তরদিকে। তাই টলেমি তাঁর মানচিত্রে গ্রীসও ও ভূমধ্য সাগরকে উপর দিকে আঁকেন। অর্থাৎ তাঁর মানচিত্রে উত্তর দিক হল উপরের অংশ। আজও আমরা এই রীতিই মেনে মানচিত্র তৈরি করছি। ক্রুসেডের সময় (দ্বাদশ শতক) কিছু সেনাঅফিসার পূর্বদিককে মানচিত্রর উপরে আঁকা শুরু করেন, কিন্তু এই রীতি বেশিদিন টেঁকেনি এবং কখনই জনপ্রিয় হয়নি। তাই আজও সমস্ত মানচিত্রে উত্তর দিকের স্থান উপরে।

❑ পাহাড়ে বেড়াতে গেলে শীত কেন করে?

এটা বেশ অদ্ভুত ব্যাপার যে, যখন তুমি পাহাড়ে উঠছ, তার মানে তুমি সূর্যের দিকে এগিয়ে যাচ্ছ, সেইমতো গরমও বাড়ার কথা, তা না হয়ে শীত কেন লাগে?

ভূমিতলের কাছের বাতাস সবচেয়ে বেশি গরম হয়। কারণ, সূর্যের তাপ ভূমিতলকে গরম করে আর ভূমি সেই তাপ ছেড়ে দিয়ে বাতাসকে গরম করে। সূর্য সরাসরি বায়ুমণ্ডলকে গরম করে না। পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের অনেকগুলি স্তর আছে। প্রধান স্তরগুলি হল ট্রপোস্ফিয়ার, স্ট্রাটোস্ফিয়ার, মেসোস্ফিয়ার এবং আয়নোস্ফিয়ার। ট্রপোস্ফিয়ার হল সবচেয়ে নিচের স্তর যেখানে আমরা বাস করি। ভূমিতল থেকে ১১০০০ মিটার উপর পর্যন্ত এর বিস্তৃতি। এই স্তরের যত উপরে তুমি উঠতে থাকবে, তাপমাত্রা ধীরে ধীরে কমতে থাকবে। প্রতি ৩০০ মিটারে তাপমাত্রা মোটামুটি ২°C কমে যায়। দার্জিলিং-এ (২১০০ মিটার) বেড়াতে গেলে তাপমাত্রা কমবে ১৪°C। অর্থাৎ কলকাতায় যখন ৪০°Cএর অসহ্য গরম, দার্জিলিং-এ তুমি পাবে ২৬°C-এর মনোরম উষ্ণতা।

গাছকে বলো মা

নির্মাল্য দাশগুপ্ত

গাছ কেটো না, গাছ কেটো না,
গাছকে বলো মা,
গাছই দিচ্ছে অশন বসন
মা কি হলো না!

গাছই না থাকল যদি
পথ হারাবে নদী
বানের জলে ভাসবে শহর
ভাসবে 'প্রাণ'-এর ছবি।

বৃষ্টি ছাড়া বাঁচবে কি আর
এই যে জীবন ধারা
এই জীবনই পুষ্ট হবে
পেয়ে পাতার সাড়া।

নাচবে জীবন, ছুটবে সবাই
খুশিতে মাতোয়াল
চরবে গরু, গাইবে পাখি
ধরবে চাষী হাল।

আদর করে গাছকে ডাকো
তাকেই ভালোবাসো
গাছকে নিয়েই বাঁচবো সবাই
শপথ করি এসো।

গাছ কেটো না, গাছ কেটো না
গাছকে বলো মা—
গাছই দেবে জীবন সুধা
এইটা ভুলো না।

স্বত্বাধিকারী ও প্রকাশক জয়দেব দে কর্তৃক ৫৮৫ অজয় ব্যানার্জী রোড (বিনোদনগর) পো ঃ কাঁচরাপাড়া, পিন-৭৪৩১৪৫, জেলা-উত্তর ২৪ পরগণা থেকে প্রকাশিত এবং তৎকর্তৃক স্ক্রীন আর্ট, ২০ নেতাজী সুভাষ পথ, পো ঃ কাঁচরাপাড়া, জেলা-উত্তর ২৪ পরগণা থেকে মুদ্রিত।

অক্ষর বিন্যাস ঃ রেজ ডট কম, ৪৪/১এ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা-৭০০০০৯ ● সম্পাদক ঃ তাপস মজুমদার। ফোন ঃ ৯৮৭৪৭৭৮২১৬/৯৪৭৪৩৩০০৯২

সম্পাদকমণ্ডলী ঃ বিজয় সরকার, প্রবীর বসু, শিবপ্রসাদ সর্দার, সম্রাট সরকার, অনুপ হালদার, সুজয় বিশ্বাস, বিবর্তন ভট্টাচার্য

E-mail : bijnandarbar1980@gmail.com / ganabijnan@yahoo.co.in